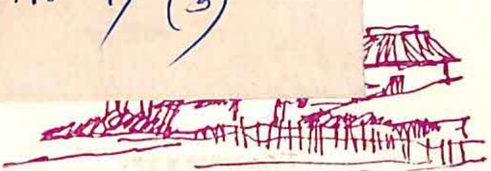
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোটদের

ছেলেবেলার গল্প



শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ঃ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯



লালু

ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল তার নাম লালু। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে—অর্থাৎ, সে এতকাল পূর্বে যে, তোমরা ঠিকমত ধারণা করতে পারবে না—আমরা ছোট বাঙালা ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়স তখন দশ-এগারো। মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার কত কৌশলই যে তার মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই। ওর-মাকে রবারের সাপ দেখিয়ে একবার এমন বিপদে ফেলেছিল যে, তিনি পা মচ্‌কে প্রায় সাত-আটদিন খুঁড়িয়ে চলতেন। তিনি রাগ করে বললেন—ওর একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে। সন্ধ্যেবেলায় এসে পড়াতে বসবেন, ও আর উপদ্রব করবার সময় পাবে না।

শুনে লালুর বাবা বললেন, না। তাঁর নিজের কখনো মাস্টার ছিল না, নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখাপড়া করে তিনি একজন বড় উকিল। ইচ্ছে ছিল, ছেলেও যেন তেমনি করেই বিদ্যা লাভ করে। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, যে-বার লালু ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম না হতে পারবে তখন থেকে থাকবে ওর বাড়িতে পড়ানোর টিউটার। সে যাত্রা লালু পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু মনে মনে রইল ও মা'র 'পরে চটে। কারণ, উনি তার ঘাড়ে মাস্টার চাপানোর চেষ্টায় ছিলেন। সে জানত বাড়িতে মাস্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।

লালুর বাপ ধনী গৃহস্থ। বছর কয়েক হলো পুরানো বাড়ি ভেঙ্গে তেতলা বাড়ি করেছেন ; সেই অবধি লালুর মায়ের আশা গুরুদেবকে এ-বাড়িতে এনে তাঁর পায়ের ধুলো নেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, ফরিদপুর থেকে এতদূরে আসতে রাজী হন না, কিন্তু এইবার সেই সুযোগ ঘটেছে। স্মৃতিরত্ন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী এসেছেন, সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছেন—ফেরবার পথে নন্দরাণীকে আশীর্বাদ করে যাবেন। লালুর মা'র আনন্দ ধরে না—উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত—এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, গুরুদেবের পায়ের ধুলো পড়বে। বাড়িটা পবিত্র হয়ে যাবে।

নীচের বড় ঘরটা থেকে আসবাবপত্র সরানো হলো, নতুন ফিতের খাট, নতুন শয্যা তৈরী হয়ে এলো,—গুরুদেব শোবেন। এই ঘরেরই এক কোণে তাঁর পূজা-আহ্নিকের জায়গা হলো, কারণ তেতলার ঠাকুরঘরে উঠতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে।

দিন-কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কি দুর্যোগ ! আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘটা, যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি—তার আর বিরাম নেই।

এদিকে মিষ্টান্নাদি তৈরি করতে, ফল-ফুল সাজাতে লালুর মা নিঃশ্বাস নেবার সময় পান না। তারই মধ্যে স্বহস্তে ঝেড়েঝুড়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বিছানা করে গেলেন। নানা কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল, পথশ্রমে ক্লান্ত গুরুদেব আহারাদি সেরে শয্যা গ্রহণ করলেন। চাকর-বাকর ছুটি পেলে। সুকোমল শয্যার পরিপাট্যে প্রসন্ন গুরুদেব মনে মনে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছাদ চুঁইয়ে মশারি ফুড়ে তাঁর সুপরিপুষ্ট পেটের উপর জল পড়চে।— উঃ, কি ঠাণ্ডা সে জল ! শশব্যস্তে বিছানার বাইরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন, বললেন, নতুন বাড়ি করলে নন্দরানী, কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এর মধ্যেই ফেটেছে দেখচি। ফিতের খাট, ভারী নয়, মশারি সুদ্ধ সেটা ঘরের আর একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আধ মিনিটের বেশী নয়, চোখ দুটি সবে বুজেছেন, অমনি দু-চার ফোঁটা তেমনি ঠাণ্ডা জল টপটপ করে পেটের ঠিক সেই স্থানটির উপরেই ঝরে পড়ল। স্মৃতিরত্ন আবার উঠলেন, আবার খাট টেনে অন্যধারে নিয়ে গেলেন, বললেন, ইঃ—ছাতটা দেখচি এ-কোণ থেকে ও-কোন পর্যন্ত ফেটে গেছে। আবার শুলেন, আবার পেটের উপর জল ঝরে পড়ল। আবার উঠে পেটের জল মুছে খাটটা টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু শোবামাত্রই তেমনি জলের ফোঁটা। আবার টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু সেখানেও তেমনি। এবার দেখলেন বিছানাটাও ভিজেছে, শোবার জো নেই। স্মৃতিরত্ন বিপদে পড়লেন। বুড়ো-মানুষ ; অজানা জায়গায় দোর খুলে বাইরে যেতেও ভয় করে, আবার থাকাও বিপজ্জনক। কি জানি ফাটা ছাত ভেঙ্গে হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে। ভয়ে ভয়ে দোর খুলে বারান্দায় এলেন, সেখানে লণ্ঠন একটা জ্বলচে বটে, কিন্তুকেউ কোথাও নেই,—ঘোর অন্ধকার।



যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝোড়ো হাওয়া ! দাঁড়াবার জো কি ? কোথায় চাকর-বাকর, কোন্ ঘরে শোয় তারা—কিছুই জানেন না তিনি। চেঁচিয়ে ডাকলেন, কিন্তু কারও সাড়া মিলল না। একধারে একটা বেঞ্চি ছিল, লালুর বাবার গরীব মক্কেল যারা, তারাই এসে বসে। গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন। আত্মমর্যাদার যথেষ্ট লাঘব হ'লো ; অন্তরে অনুভব করলেন, কিন্তু উপায় কি ! উত্তরে বাতাসে বৃষ্টির ছাঁটের আমেজ রয়েছে—শীতে গা শিরশির করে—কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পা দুটি যথাসম্ভব উপরে তুলে, যথাসম্ভব আরাম পাবার

আয়োজন করে নিলেন। নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে দেহ অবশ, মন তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুর, অনভ্যস্ত গুরুভাজন ও রাত্রি-জাগরণে দু-একটা অম্ল উদ্গারের আভাস দিলে—উদ্বেগের অবধি রইল না! হঠাৎ এমনি সময় অভাবনীয় নতুন উপদ্রব। পশ্চিমের বড় বড় মশা দুই কানের পাশে এসে গান জুড়ে দিলে। চোখের পাতা প্রথমে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কি জানি এরা সংখ্যায় কত। মাত্র মিনিট-দুই—অনিশ্চিত নিশ্চিত হ'লো; গুরুদেব বুঝলেন সংখ্যায় এরা অগণিত। সে বাহিনীকে উপেক্ষা করে বিশ্বে এমন বীরপুরুষ কেউ নেই। যেমন তার জ্বলুনি তেমনি তার চুলকানি। স্মৃতিরত্ন দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন, কিন্তু তারা সঙ্গ নিলে। ঘরের ঘধ্যে জলের জন্য যেমন, ঘরের বাইরে মশার জন্য তেমন। হাত-পায়ের নিরন্তর আক্ষেপে, গামছার সঘন সঞ্চালনে কিছুতেই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। স্মৃতিরত্ন এ-পাশ থেকে ও-পাশে ছুটে বেড়াতে লাগলেন, শীতের মধ্যেও তাঁর গায়ে ঘাম দিলে। ইচ্ছে হ'লো ডাক ছেড়ে চেঁচান, কিন্তু নিতান্ত বালকোচিত হবে ভেবে বিরত রইলেন। কল্পনায় দেখলেন নন্দরানী সুকোমল শয্যায় মশারির মধ্যে আরামে নিদ্রিত, বাড়ির যে যেখানে আছে পরম নিশ্চিন্তে সুপ্ত—শুধু তাঁর ছুটোছুটিরই বিরাম নেই। কোথাকার ঘড়িতে চারটে বাজলো, বললেন, কামড়া ব্যাটারা যত পারিস, কামড়া,—আমি আর পারিনে।—বলেই বারান্দার একটা কোণে পিঠের দিকটা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, সকাল পর্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে ত এ দুর্ভাগা দেশে আর না। যে গাড়ি প্রথমে পাব সেই গাড়িতে দেশে পালাব। কেন যে এখানে আসতে মন চাইত না তার হেতু বোঝা গেল। দেখতে দেখতে সর্বসন্তাপহর নিদ্রায় তাঁর সারারাত্রির সকল দুঃখ মুছে দিলে,—স্মৃতিরত্ন অচেতনপ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে নন্দরানী ভোর না হ'তেই উঠেছেন,—গুরুদেবের পরিচর্যায় লাগতে হবে। রাত্রে গুরুদেব জলযোগ মাত্র করেছেন—যদিচ গুরুতর—তবু মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, খাওয়া তেমন ভাল হয় নাই। আজ দিনের বেলা নানা উপাচারে তা ভরিয়ে তুলতে হবে।

নীচে নেমে এলেন, দেখেন দোর খেলা। গুরুদেব তাঁর আগে উঠেছেন ভেবে একটু লজ্জা বোধ হ'লো। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন তিনি নেই, কিন্তু এ কি ব্যাপার! দক্ষিণ দিকের খাট উত্তর দিকে, তাঁর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা জানালা ছেড়ে মাঝখানে নেমেচে, কোষাকুষি, আসন প্রভৃতি পূজাআহ্নিকের জিনিসপত্রগুলো সব এলোমেলো স্থানভ্রষ্ট,—কারণ কিছুই বুঝলেন না। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন, তারা কেউ তখনও ওঠেনি। তবে একলা গুরুদেব গেলেন কোথায়! হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—ওটা কি? এক কোণে আলো-অন্ধকারে মানুষের মত কি একটা বসে না! সাহসে ভর করে একটু কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন তার গুরুদেব। অব্যক্ত আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠাকুরমশাই! ঠাকুরমশাই!

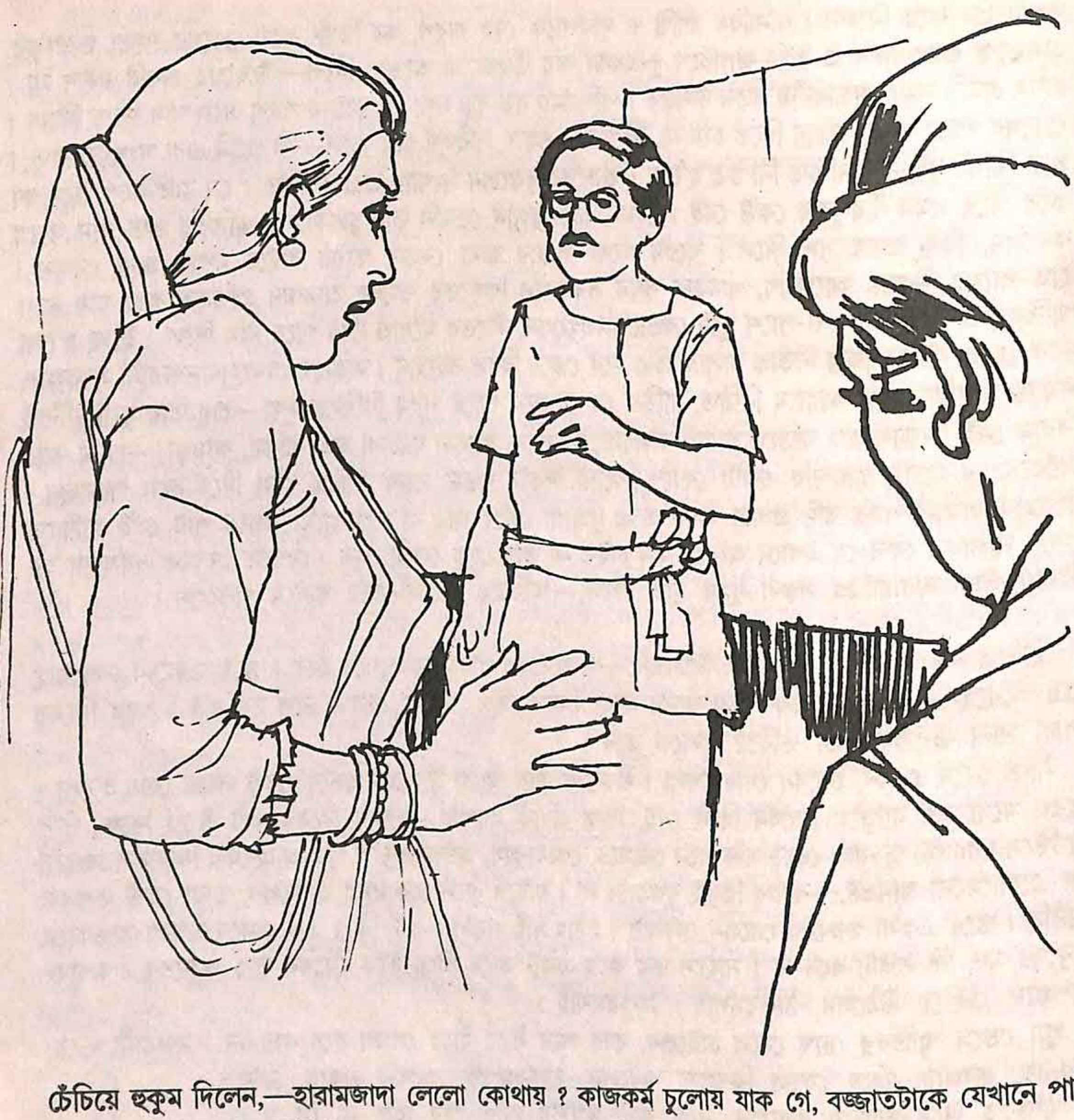
ঘুম ভেঙ্গে স্মৃতিরত্ন চোখ মেলে চাইলেন, তার পরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। নন্দরানী ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরমশাই, আপনি এখনে কেন?

স্মৃতিরত্ন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারা রাত দুঃখের আর পার ছিল না যে মা!

কেন বাবা?

নতুন বাড়ি করেচ বটে মা, কিন্তু ছাত কোথাও আর আস্ত নেই। সারা রাতের বৃষ্টি-বাদল বাইরে ত পড়েনি, পড়েচে আমার গায়ের উপর। খাট টেনে যেখানে নিয়ে যাই সেখানেই পড়ে জল। পাছে ছাত ভেঙ্গে মাথায় পড়ে, পালিয়ে এলাম বাইরে, কিন্তু তাতেই কি রক্ষে আছে মা, পঙ্গপালের মত ডাঁশ-মশা ঝাঁকে ঝাঁকে সমস্ত রাত্রি যেন ছুবলে খেয়েছে,—এধার থেকে ছুটে ওধারে যাই, আবার ওধার থেকে ছুটে এধারে আসি। গায়ের অর্ধেক রক্ত বোধ করে আর নেই মা।

বহু প্রয়াস, বহু সাধ্য সাধনায় ঘরে আনা বৃদ্ধ গুরুদেবের অবস্থা দেখে নন্দরানীর দু'চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠল, বললেন, কিন্তু বাবা, বাড়িটা যে তেতলা, আপনার ঘরের উপর আরও যে দুটো ঘর আছে, বৃষ্টির জল তিন-তিনটে ছাদ ফুঁড়ে নামবে কি করে? কিন্তু বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হলো এ হয়ত ঐ শয়তান লালুর কোনরকম শয়তানি বুদ্ধি। ছুটে গিয়ে বিছানা হাতড়ে দেখেন মাঝখানে চাদর অনেকখানি ভিজে এবং মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দেখতে পেলেন ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙর বরফ সবটা গলেনি, তখনও এক টুকরো বাকি আছে। পাগলের মত ছুটে গিয়ে চাকরদের যাকে সমুখে পেলেন



চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন,—হারামজাদা লেলো কোথায় ? কাজকর্ম চুলোয় যাক গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন্‌।

লালুর বাবা সেইমাত্র নামছিলেন, স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন,—কি কাণ্ড করচ ? হলো কি ?

নন্দরানী কেঁদে ফেলে বললেন, হয় তোমার ঐ লেলোকে বাড়ি থেকে তাড়াও, না হয় আজই আমি গঙ্গায় ডুবে এ-মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করব।

কি করলে সে ?

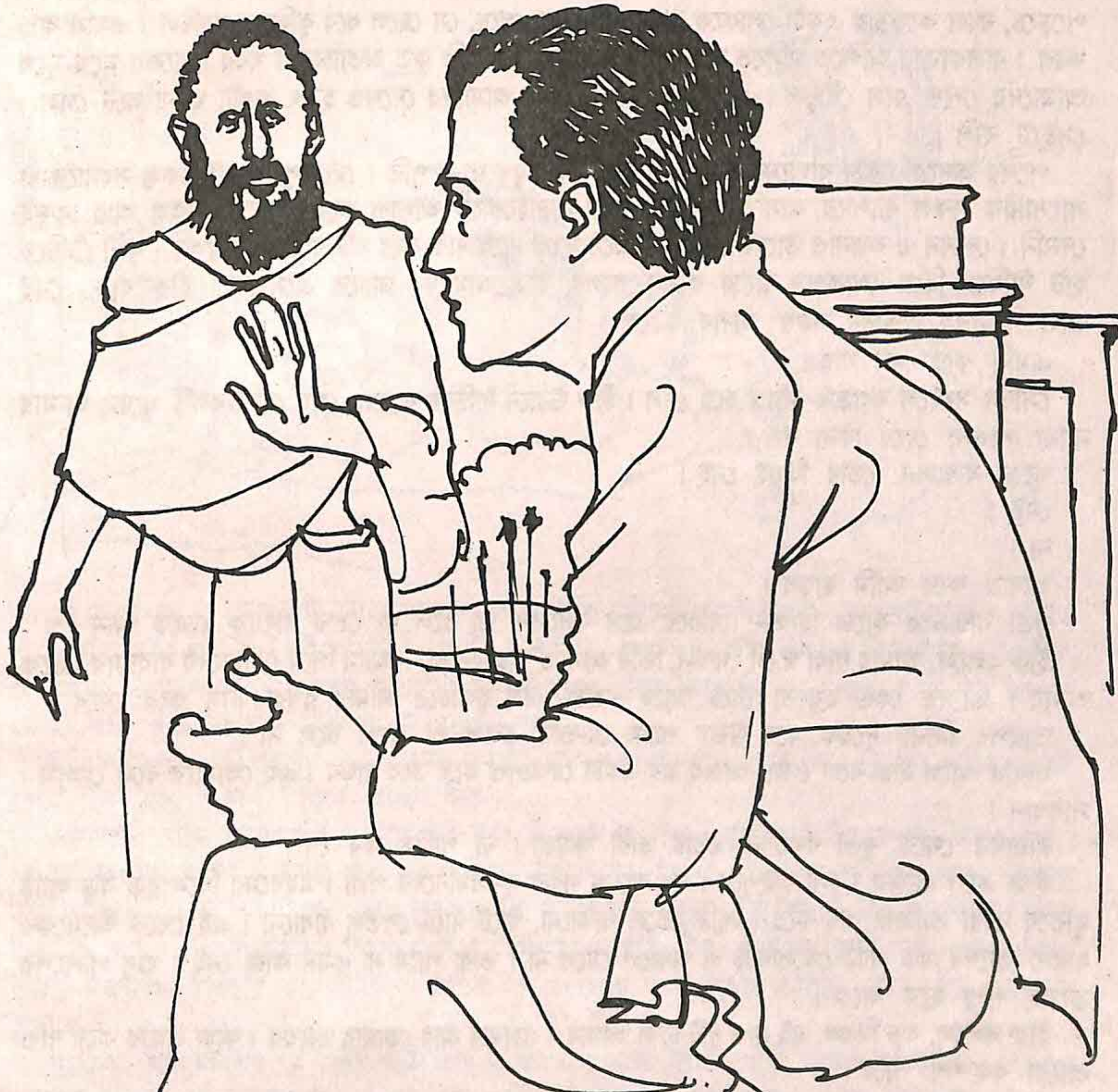
বিনা দোষে গুরুদেবের দশা কি করেছে চোখে দেখোসে। তখন সবাই গেলেন ঘরে। নন্দরানী সব বললেন, সব দেখালেন। স্বামীকে বললেন, এ দস্যি ছেলেকে নিয়ে ঘর করব কি করে তুমি বল ?

গুরুদেব ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন। নিজের নির্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে হেসে ফেললেন। লালুর বাবা আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাকররা এসে বললে, লালুবাবু কোঠি মে নহি হ্যায়। আর একজন এসে জানালে সে মাসীমার বাড়িতে বসে খাবার খাচ্ছে। মাসীমা তাকে আসতে দিলেন না।

মাসীমা মানে নন্দর ছোট বোন। তার স্বামীও উকিল, সে অন্য পাড়ায় থাকে।

এর পরে লালু দিন-পনেরো আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিলে না।



ছেলেধরা

সেবার দেশময় রটে গেল যে, তিনটি শিশু বলি না দিলে রূপনারায়ণের উপর রেলের পুল কিছুতেই বাঁধা যাচ্ছে না। দু'টি ছেলেকে জ্যান্ত থামের নীচে পোঁতা হয়ে গেছে, বাকী শুধু একটি। একটি সংগ্রহ হলেই পুল তৈরী হয়ে যায়। শোনা গেল, রেল-কোম্পানির নিযুক্ত ছেলেধরারা শহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা কখন এবং কোথয় এসে হাজির হবে, কেউ বলতে পারেন না। তাদের কারও পোশাক ভিখিরীর, কারও বা সাধু-সন্ন্যাসীর, কেউ বা বেড়ায় লাঠি হাতে ডাকাতের মত—এ জনশ্রুতি পুরানো, সুতরাং কাছাকাছি পল্লীবাসীর ভয়ের ও সন্দেহের সীমা রহিল না যে এবার হয়ত তাদের পালা, তাদের ছেলেপুলেই হয়ত পুলের তলায় পোঁতা যাবে।

কারও মনে শান্তি নেই, সব বাড়িতেই কেমন একটা ছমছম ভাব। আবার তার উপরে আছে খবরের কাগজের খবর। কলকাতায় যারা চাকরি করে তারা এসে জানায়, সেদিন বউবাজারে একটা ছেলেধরা ধরা পড়েচে, কাল কড়েয়ায় একটা লোককে হাতে-নাতে ধরা গেছে, সে ছেলে ধরে ঝুলিতে পুরছিল। এমনি কত খবর! কলকাতার অলিতে গলিতে সন্দেহক্রমে কত নিরীহের প্রতি কত অত্যাচারের খবর লোকের মুখে মুখে আমাদের দেশে এসে পৌছুল। এমন যখন অবস্থা তখন আমাদের দেশেও হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেইটে বলি।

পথের অদূরে একটা বাগানের মধ্যে বাস করেন বৃদ্ধ মুখুজ্যে-দম্পতি। ছেলেপুলে নেই, কিন্তু সংসারে ও সাংসারিক সকল ব্যাপারে আসক্তি আঠারো আনা। ভাইপোকে আলাদা করে দিয়েছেন, কিন্তু আর কিছুই দেননি। দেবেন এ-কল্পনাও তাঁদের নেই। সে এসে মাঝে মাঝে দাবী করে ঘটি-বাটি-তৈজসপত্র; খুড়ী চেঁচিয়ে হাট বাঁধিয়ে দিয়ে লোকজন জড়ো করেন, বলেন, হীরু আমাদের মারতে এসেছিল। হীরু বলে, সেই ভাল—মেরেই একদিন সমস্ত আদায় করবো।

এমনি করে দিন যায়।

সেদিন সকালে ঝগড়ার চূড়ান্ত হয়ে গেল। হীরু উঠানে দাঁড়িয়ে বললে, শেষ বেলা বলচি খুড়ো, আমার ন্যায্য পাওনা দেবে কিনা বল?

খুড়ো বললেন, তোর কিছুই নেই।

নেই?

না।

আদায় করে আমি ছাড়ব।

খুড়ী রান্নাঘরে কাজে ছিলেন, বেরিয়ে এসে বললেন, তা হলে যা তোর বাবাকে ডেকে আন্ গে।

হীরু বললে, আমার বাবা স্বর্গে গেছেন, তিনি আসতে পারবেন না,—আমি গিয়ে তোমাদের বাবাদের ডেকে আনব। তাদের কেউ হয়তো বেঁচে আছে—তারা এসে চুলচিরে আমার বখ্‌রা ভাগ করে দেবে।

তারপর মিনিট দুয়েক ধরে উভয় পক্ষে যে-ভাষা চলল তা লেখা চলে না।

যাবার আগে হীরু বলে গেল, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব। এই তোমারে বলে গেলুম। সাবধান!

রান্নাঘর থেকে খুড়ী বললেন, তোর ভারী ক্ষমতা! যা পারিস কর গে।

হীরু এসে হাজির হ'লো রাইপুরে। ঘর-কয়েক গরীব মুসলমানদের পল্লী। মহরমের দিনে বড় বড় লাঠি ঘুরিয়ে তারা তাজিয়া বার করে। লাঠি তেলে পাকানো, গাঁটে গাঁটে পেতল বাঁধানো। এই থেকে অনেকের ধারণা তাদের মত লাঠি-খেলোয়াড় এ অঞ্চলে মেলে না। তারা পারে না এমন কাজ নেই। শুধু পুলিশের ভয়েই শান্ত হয়ে থাকে।

হীরু বললে, বড় মিঞা, এই নাও দুটি টাকা আগাম। তোমার আর তোমার ভায়ের। কাজ উদ্ধার করে দাও আরো বক্‌শিশ পাবে।

টাকা দুটি হাতে নিয়ে লতিফ মিঞা হেসে বললে, কি কাজ বাবু?

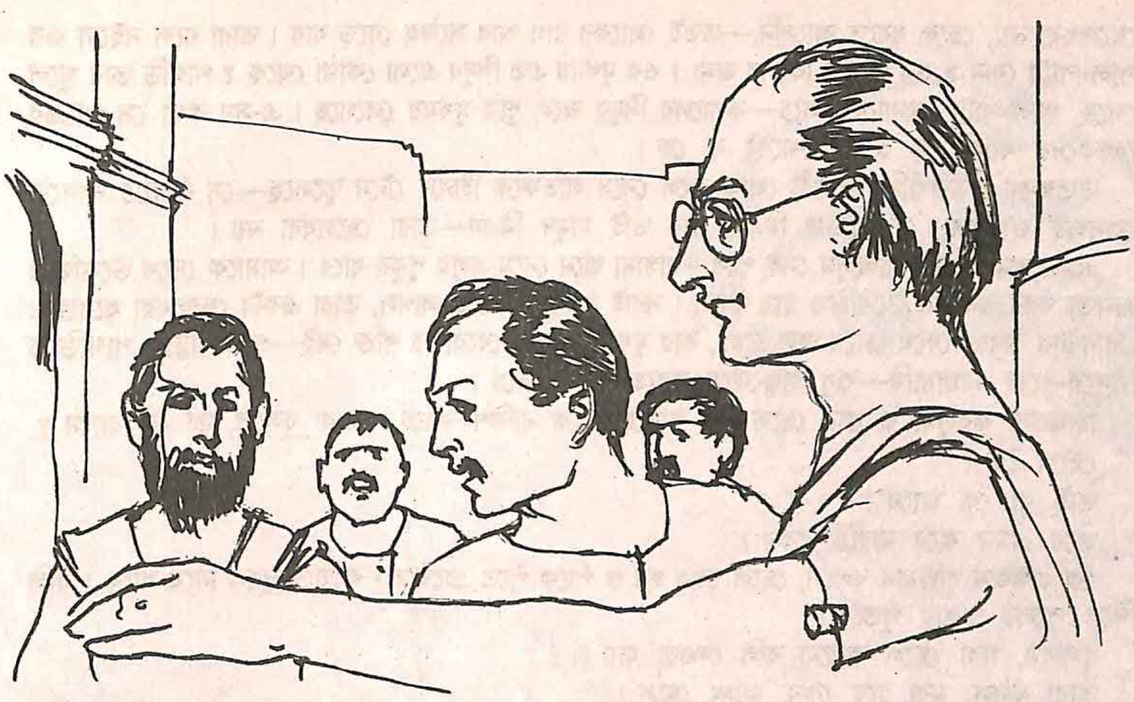
হীরু বললে, এদেশে কে জানে না তোমাদের দু-ভায়ের কথা! লাঠির জোরে বিশ্বাসদের কত জমিদারি হাসিল করে দিয়েছে—তোমরা মনে করলে পার না কি!

বড় মিঞা চোখ টিপে বললে, চুপ্ চুপ্‌বাবু, থানার দারোগা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। বীরনগর গ্রামখানাই যে দু-ভায়ে দখল করে দিয়েছি, এ যে তারা জানে। কেউ চিনতে পারেনি বলেই তা সে-যাত্রা বেঁচে গেছি।

হীরু আশ্চর্য হয়ে বললে, কেউ চিনতে পারেনি?

লতিফ বললে, পারবে কি করে! মাথায় ইয়া পাগ্ বাঁধা, গাল-পাট্টা, কপালে কপাল-জোড়া সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ছ-হাতি লাঠি,—লোকে ভাবলে হিঁদুর যমপুরী থেকে যমদূত এসে হাজির হ'লো। চিনবে কি—কোথায় পালাল তার ঠিকানা রইল না।

হীরু তার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, বড় মিঞা, এই কাজটি আর একবার তোমাকে করতে হবে, দাদা।



আমার খুড়ো তবু যা হোক দুটো ভাগের ভাগ দিতে চায়, কিন্তু খুড়ীবেটী এমনি শয়তান যে একটা চুমকি ঘটিতে পর্যন্ত হাত দিতে দেয় না। ওই পাগড়ি, গালপাট্টা, আর সিঁদুর মেখে লাঠি হাতে একবার গিয়ে উঠানে দাঁড়াবে, তোমাদের ডাকাতে-হুমকি একবার ঝাড়বে, তার পর দেখে নেবো কিসে কি হয়। আমার যা-কিছু পাওনা ফেঁড়ে বার করে আনব। ঠিক সন্ধ্যার আগে—ব্যাস্।

লতিফ মিঞা রাজী হলো। লতিফ মামুদ দু-ভাই সাজ-পোশাক পরে আজই গিয়ে খুড়োর বাড়িতে হানা দেবে ঠিক হয়ে গেল। পিছনে থাকবে হীরু।

একাদশী। সারা দিনের পর দাওয়ায় ঠাঁই করে দিয়েছেন জগদম্বা। মুখুজ্যেমশাই বসেছেন জলযোগে। সামান্য ফলমূল ও দুধ। বেতো ধাত—একদশীতে অন্নাহার সহ্য হয় না। পাথরের বাটিতে ডাবের জলটুকু মুখে তুলেছেন, এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকল দু-ভাই লতিফ আর মামুদ। ইয়া পাগড়ি, ইয়া গাল-পাট্টা, হাতে ছ-হাতি লাঠি, কপাল-জোড়া সিঁদুর-মাখানো। মুখুজ্যের হাতথেকে পাথরের বাটি দুম করে পড়ে গেল,—জগদম্বা চীৎকার করে উঠলেন—ওগো পাড়ার লোক, কে কোথায় আছো, এসো গো, ছেলেধরা ঢুকেছে।

সুমুখের ছোট মাঠটায় ঘর কেটে ছোট ছোট ছেলের দল রোজ ফিঞে খেলে, আজও খেলছিল,—তারাও চেঁচাতে চেঁচাতে যে যেখানে পারলে, ছুট দিলে—ওগো ছেলেধরা এসেচে, অনেক ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

হীরু সঙ্গে এসেছিল বাড়ি চিনিয়ে দিতে। দোরের আড়ালে লুকিয়েছিল—সে চাপা গলায় বললে,—আর দেখ কি মিঞা, পালাও। পাড়ার লোক ধরে ফেললে আর রক্ষে নেই। বলেই নিজে মারলে ছুট।

লতিফ মিঞা শহরের আর কিছু না শুনে থাক, ছেলেধরার জনশ্রুতি তাদের কানে এসেও পৌঁছেছে। চক্ষের পলকে বুঝলে এ অজানা জায়গায় এরূপ বেশে এই সিঁদুর মাখা মুখে ধরা পড়ে গেলে দেহের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না। সুতরাং তারাও মারল ছুট। কিন্তু ছুটলে হবে কি ? পথ অচেনা, আলো এসেছে কমে—চুতর্দিক থেকে কেবল বহুকণ্ঠের সমবেত চীৎকার—ধরে ফ্যাল্, ধরে ফ্যাল্ ! মেরে ফ্যাল্ ব্যাটাদের ! ছোট ভাই মামুদ কোথায় পালাল ঠিকানা নেই, কিন্তু বড় ভাই লতিফকে সবাই ঘিরে ফেললে—সে প্রাণের দায়ে কাঁটা বন ভেঙ্গে লাফিয়ে পড়ল একটা ডোবায়। তার পর সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ঢিল। যেই মাথা তোলে অমনি মাথায় পড়ে ঢিল। আবার সে মারে ডুব। আবার উঠে, আবার মাথায় পড়ে ঢিল।

লতিফ মিঞা জল খেয়ে আর ইঁট খেয়ে আধমরা হয়ে পড়ল। যে যতই হাতজোড় করে বলতে চায় সে

ছেলেধরা নয়, ছেলে ধরতে আসেনি,—ততই লোকের রাগ আর সন্দেহ বেড়ে যায়। তারা বলে নইলে ওর পাল-পাট্টা কেন ? ওর পাগড়ি কিসের জন্য ? ওর মুখময় এত সিঁদুর এলো কোথা থেকে ? পাগড়ি তার খুলে গেছে, পাল-পাট্টা একধারে ঝুলচে—কপালের সিঁদুর জলে ধুয়ে মুখময় লেগেছে। এ-সব কথা সে পাড়ের লোকদের বলেই বা কখন, শোবেই বা কে।

ততক্ষণে কতকগুলি উৎসাহী লোক জলে নেমে লতিফকে হিঁচড়ে টেনে তুলেছে—সে কাঁদতে কাঁদতে কেবলই জানাচ্ছে, সে লতিফ মিঞা, তার ভাই মামুদ মিঞা—তারা ছেলেধরা নয়।

এমন সময় আমি যাচ্ছিলুম সেই পথে—হাঙ্গামা শুনে নেমে এলুম পুকুর-ধারে। আমাকে দেখে উত্তেজিত জনতা আর একবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সবাই সমস্বরে বলতে লাগল, তারা একটা ছেলেধরা ধরেছে। লোকটার অবস্থা দেখে চোখে জল এলো, তার মুখ দিয়ে কথা বেরোবার শক্তি নেই—গাল-পাট্টায়, পাগড়িতে সিঁদুরে-রক্তে মাখামাখি—শুধু হাতজোড় করছে আর কাঁদচে।

জিজ্ঞাসা করলুম, ও কার ছেলে চুরি করেছে ? কে নালিশ করচে ? তারা বললে, তা কে জানে ?

ছেলে কৈ ?

তাই বা কে জানে ?

তবে এমন করে মারচো কেন ?

কে একজন বুদ্ধিমান বললে, ছেলে বোধ হয় ও পাঁকে পুঁতে রেখেচে। রাত্তিরে তুলে নিয়ে যাবে। বলি দিয়ে পুলের তলায় পুঁতবে।

বললুম, মরা ছেলে কখনো বলি দেওয়া যায় ?

তারা বলল, মরা হবে কেন, জ্যান্ত ছেলে।

পাঁকে পুঁতে রাখলে ছেলে জ্যান্ত থাকে কখনো ?

যুক্তিটা তখন অনেকের কাছেই সমীচীন বোধ হ'লো। এতক্ষণ উত্তেজনার মুখে সে কথা কেউ ভাববারই সময় পায়নি।

বললুম, ছাড় ওকে। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম—মিঞা, ব্যাপারটা সত্যি কি বল ত ?

এখন অভয় পেয়ে লোকটা কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলে, মুখুজ্যে দম্পতির উপর কারও সহানুভূতি ছিল না, শুনে অনেকের করুণাও হলো।

বললুম, লতিফ বাড়ি যাও, আর কখনও এ-সব কাজে এসো না।

সে নাক মললে, কান মললে—খোদার কিরে নিয়ে বললে, বাবুমশায়, আর এ-সব কাজে কখনো না। কিন্তু আমার ভাই গেল কোথায় ?

বললুম ভায়ের ভাবনা বাড়ি গিয়ে ভেবো লতিফ, এখন নিজের প্রাণটা বাঁচল এই ঢের। লতিফ খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনমতে বাড়ি চলে গেল।

অনেক রাত্রে একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ঘোষালদের পাড়ায়। তাদের ঝি গোয়ালে ঢুকেছিল গরুকে জাব দিতে। খড়ের ঝুড়ি টানতে গিয়ে দেখে টানা যায় না—হঠাৎ তার মধ্যে থেকে একটা ভীষণ মূর্তি লোক বেরিয়ে ঝির পা-দুটো জড়িয়ে ধরলে।

ঝি যতই চেঁচায়, বেরোও গো, কে কোথা আছ,—ভূত আমাকে খেয়ে ফেললে। ভূত ততই তার মুখ চেপে ধরে বলে, মা গো আমাকে বাঁচাও—আমি ভূত-পেরেত নই, আমি মানুষ।

চীৎকারে বাড়ির কর্তা আলো নিয়ে লোকজন নিয়ে এসে উপস্থিত—আগের ঘটনা গাঁয়ের সবাই শুনেছে। সুতরাং ছোট ভায়ের ভাগ্যে বড় ভাইয়ের দুর্গতি আর ঘটল না, সবাই সহজে বিশ্বাস করলে এই সেই মামুদ মিঞা। ভূত নয়।

ঘোষাল তাকে ছেড়ে দিলে—শুধু তার সেই পাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে বললে, ছোট মিঞা, সমস্ত জীবন মনে থাকবে বলে এটা রেখে দিলুম। মুখের ঐ সব রং-টং ধুয়ে এখন আস্তে আস্তে ঘরে যাও।

কৃতজ্ঞ মামুদ এক শ' সেলাম জানিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ল। ঘটনাটি ছেলেভুলানো গল্প নয়, সত্যই আমাদের ওখানে ঘটেছিল।



লালুর পাঁঠাবলি

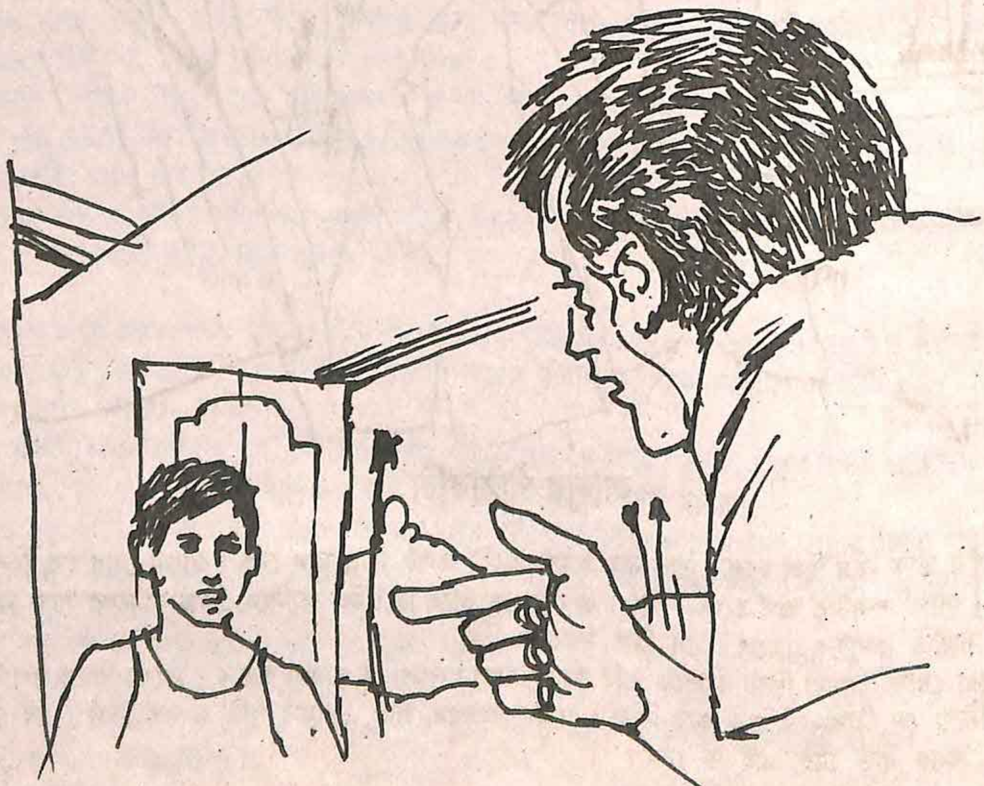
তার ডাক নাম ছিল লালু। ভাল নাম অবশ্য একটা ছিলই, কিন্তু মনে নেই। জানো বোধ হয়, হিন্দীতে 'লাল' শব্দটার অর্থ হচ্ছে—প্রিয়। এ-নাম কে তারে দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নামের এমন সঙ্গতি কদাচিৎ মেলে। সে ছিল সকলের প্রিয়।

ইস্কুল ছেড়ে আমরা গিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম, লালু বললে, সে ব্যবসা করবে। মায়ের কাছে দশ টাকা চেয়ে নিয়ে সে ঠিকেদারি শুরু করে দিলে। আমরা বললাম, লালু, তোমার পুঁজি ত দশ টাকা। সে হেসে বললে, আর কত চাই, এই ত ঢের।

সবাই তাকে ভালবাসতো, তার কাজ জুটে গেল। তার পরে কলেজের পথে প্রায়ই দেখতে পেতুম, লালু ছাতি মাথায় জনকয়েক কুলি-মজুর নিয়ে রাস্তার ছোটখাটো মেরামতির কাজে লেগেছে। আমাদের দেখে হেসে তামাশা করে বলতো,—যা যা দৌড়ো—পারসেন্টেজের খাতায় এখুনি ঢ্যারা পড়ে যাবে।

আরও ছোটকালে যখন আমরা বাংলা ইস্কুলে পড়তাম, তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রী। তার বইয়ের থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত একটা হামানদিস্তার ডাঁটি, একটা নরুণ, একটা ভাঙ্গা ছুরি, ফুটো করবার একটা পুরোনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল,—কি জানি কোথা থেকে সে এ-সব সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু এ দিয়ে পারতো না সে এমন কাজ নেই। ইস্কুল-সুদ্ধ সকলের ভাঙ্গা ছাতি সারানো, শ্লেটের ফ্রেম আঁটা, খেলতে গিয়ে ছিঁড়ে গেলে তখনি জামা-কাপড় সেলাই করে দেওয়া—এমন কত কি। কোন কাজে কখনো না বলতো না। আর করতোও চমৎকার। একবার 'ছট' পরবের দিনে কয়েক পয়সার রঙ্গিন কাগজ আর শোলা কিনে কি একটা নতুন তৈরি করে সে গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায় আড়াই টাকার খেলনা বিক্রি করে ফেললে। তার থেকে আমাদের পেটভরে চিনেবাদাম-ভাজা খাইয়ে দিলে।

বছরের পরে বছর যায়, সকলে বড় হয়ে উঠলাম। জিমনাস্টিকের আখড়ায় লালুর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তার গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, সাহস ছিল তেমনি অপরিসীম। ভয় কারে কয় সে বোধ করি জানতো না। সকলের ডাকেই সে প্রস্তুত, সবার বিপদেই সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। কেবল তার একটা মারাত্মক দোষ ছিল, কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেলে সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারতো না। এতে ছেলে-বুড়ো-গুরুজন সবাই তার কাছে সমান। আমরা কেউ ভেবে পেতুম না, ভয় দেখাবার এমন সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় একনিমিষে কোথা থেকে আসে! দু'-একটা ঘটনা বলি। পাড়ার মনোহর চাটুজ্জের বাড়ি কালীপুজো। দুপুর-রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটলো ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো,—উপায়? এত রাত্রে ঘাতক মিলবে কোথায়? দেবীর পূজো পণ্ড হয়ে যায় যে! কে একজন বললে, পাঁঠা কাটতে পারে লালু। এমন অনেক সে কেটেছে। লোক দৌড়ল তার কাছে, লালু ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলো, বললে—না।



না কি গো ? দেবীর পূজোয় ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে !

লালু বললে, হয় হোক গে। ছোটবেলায় ও কাজ করেছি, কিন্তু এখন আর করব না।

যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগলো আর দশ-পনরো মিনিট মাত্র সময়, তার পরে সব নষ্ট সব শেষ। তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন,—না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও। সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নেই।

লালুকে দেখে চ্যাটুজ্জে মশায়ের ভাবনা ঘুচলো। সময় নেই,—তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, বাড়িসুদ্ধ সকলের 'মা' 'মা' রবের প্রচণ্ড চীৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল, লালুর হাতের খড়্গ নিমিষে উর্ধ্বোত্থিত হয়েই সজোরে নামলো, তার পরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তের ফোয়রা কালো মাটি রাঙ্গা করে দিল। লালু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইল। ক্রমশঃ ঢাক ঢোল কাঁসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এলো। যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আবার তার কপালে চড়ল সিঁদুর, গলায় দুললো রাঙ্গা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ঙ্কর অন্তিম আবেদন, সেই বহুকণ্ঠের সম্মিলিত 'মা' 'মা' ধ্বনি। আবার লালুর চক্তমাখা খাড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নীচে নেমে এলো,—পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বার-কয়েক হাত-পা আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হ'লো ; তার কাটা-গলার রক্তধারা রাঙ্গামাটি আরও খানিকটা রাঙ্গিয়ে দিলে।

ঢুলিরা উন্মাদের মতো ঢোল বাজাচ্ছে, উঠানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বহু লোকের বহু প্রকারের কোলাহল ; সুমুখের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে মনোহর চ্যাটুজ্জে মদ্রিতনেত্রে ইষ্টনাম জপে রত, অকস্মাৎ লালু ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। সমস্ত শব্দ-সাড়া গেল থেমে—সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আবার কি ! লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের তারা দুটো যেন ঘুরছে, চেঁচিয়ে বললে, আর পাঁঠা কৈ ? বাড়ির কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দু'টো করেই বলি হয়। লালু তার রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার-দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশকণ্ঠে গর্জন কর উঠলো—নেই পাঁঠা ? সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে—দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাবো ধরে নরবলি দেব—মা মা—জয়-কালী ! বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে পড়লো, তার হাতের খাঁড়া তখন বনবন করে ঘুরছে। তখন যে কাণ্ড ঘটলো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সবাই একসঙ্গে ছুটলো সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়িতে সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়েছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কারও পায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করচে, কারও গলা কারও বগলের চাপের মধ্যে পড়ে দম আটকাবার মত হয়েছে, একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে,—কিন্তু এ-সব মাত্র মুহূর্তের জন্য। তার পরেই সমস্ত ফাঁকা।

লালু গর্জে উঠলো—মনোহর চাটুজ্জে কৈ ? পুরুত গেল কোথায় ?

পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুর-দালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েচেন। কিন্তু, বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। লালু এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরলে, বললে, চলো হাড়িকাঠে গিয়ে গলা দেবে।

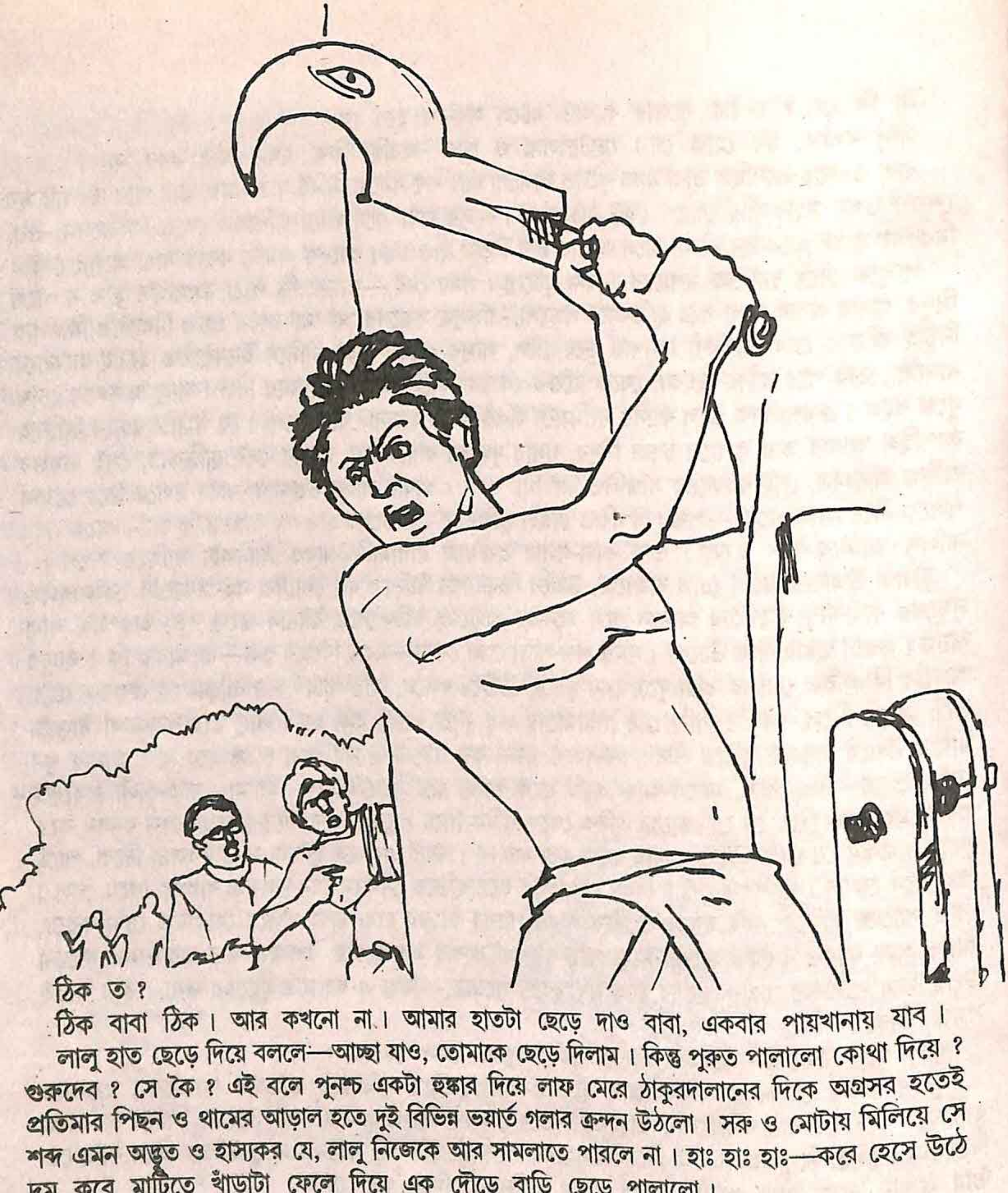
একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদো-কাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন, লালু ! বাবা ! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ—আমি পাঁঠা নই, মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা, তোমার বাবা আমার ছোট ভাইয়ের মত।

সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে—চলো তোমাকে বলি দেব ! মায়ের আদেশ !

চাটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—না, বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখনো নয়—মা জে জগজ্জননী !

লালু বললে—জগজ্জননী ! সে জ্ঞান আছে তোমার ? আর দেবে পাঁঠা-বলি ? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে ? বলো।

চাটুজ্জে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কোনদিন নয় বাবা, আর কোনদিন নয়, মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করচি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।



ঠিক ত ?

ঠিক বাবা ঠিক। আর কখনো না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাব।

লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালালো কোথা দিয়ে ? গুরুদেব ? সে কৈ ? এই বলে পুনশ্চ একটা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুরদালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন ভয়ার্ত গলার ক্রন্দন উঠলো। সরু ও মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর যে, লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ—করে হেসে উঠে দুম্ করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো।

তখন কারো বুঝতে বাকী রইল না খুন-চাপা-টাপা সব মিথ্যে, সব তার চালাকি। লালু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল ফিরে এসে জুটলো। ঠাকুরের পূজো তখনো বাকী, তাতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছে, এবং মহা হৈ চৈ কলরবের মধ্যে চাটুজ্জে মশাই সকলের সম্মুখে বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন—ঐ বজ্জাত ছোঁড়াটাকে যদি না কাল সকালেই ওর বাপকে দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতো খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজ্জে নয়।

কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয়নি। ভোরে উঠেই সে যে কোথায় পালালো, সাত-আটদিন কেউ তার খোঁজ পেলে না। দিন-সাতেক পরে একদিন অন্ধকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ক্ষমা এবং পায়ের ধূলো নিয়ে সে-যাত্রা বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেলে। কিন্তু সে যাই হোক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্জেবাড়ির কালীপূজোয় তখন থেকে পাঁঠাবলি উঠে গেল।



পঞ্চাশ-বছর পূর্বের একটা দিনের কাহিনী

ঠ্যাঙাড়ের কথা শুনেছে অনেকে এবং আমাদের মতো যারা বুড়ো তারা দেখেচেও অনেকে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও পশ্চিম বাঙলায়, অর্থাৎ হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এদের উপদ্রব ছিল খুব বেশী। তারও আগে, অর্থাৎ ঠাকুরমাদের যুগে, শুনেছি, লোক-চলাচলের প্রায় কোন পথই সন্ধ্যার পরে পথিকের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এই দুর্বৃত্তরা ছিল যেমন লোভী তেমনি নির্দয়। দল বেঁধে পথের ধারে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকতো, হাতে থাকতো বড় বড় লাঠি এবং কাঁচা বাঁশের ভারী ছোট ছোট খেঁটে, তাকে বলত পাব্ড়া। পথিক চলে গেলে তার পা লক্ষ্য করে পিছন থেকে ছুঁড়ে মারতো সেই পাব্ড়া। অব্যর্থ তার সন্ধান। অতর্কিতে পায়ে চোট খেয়ে সে যখন পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়তো, তখন সকলে ছুটে এসে দুম্‌দাম লাঠি মেরে তার জীবন শেষ করতো। এর ভাবা-চিন্তা বাছবিচার নেই! এদের হাতে প্রাণ দিয়েছে এমন অনেক লোককে আমি নিজের চোখেই দেখেচি।

ছেলেবেলায় আমার মাছধরার বাতিক ছিল খুব বেশী। অবশ্য মস্ত ব্যাপার নয়,—পুঁটি, চ্যালা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ। ভোর না হতেই ছিপ-হাতে নদীতে গিয়ে হাজির হতাম। আমাদের গ্রামের প্রান্তে হাজা মজা ক্ষুদ্র নদী, কোথাও কোমরেব বেশী জল নেই, সমস্তই শৈবালে সমাচ্ছন্ন—তার মাঝে মাঝে যেখানে একটু ফাঁক সেখানেই এই সব ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াত। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সেইগুলি ধরার ছিল আমার বড়

আনন্দ। একলা নদীর তীরে মাছের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কতদিন দেখেছি কাদায় শ্যাওলায় মাখামাখি মানুষের মৃতদেহ। কোনটার মাথা থেকে হয়তো তখনও রক্ত ঝরে জলটা রাঙ্গা হয়ে আছে। নদীর দুই তীরেই ঘন বনজঙ্গল, কি জানি কোথাকার মানুষ, কোথা থেকে ঠ্যাঙাড়েরা মেরে এনে এই জনবিরল নীদর পাঁকে পুঁতে দিত। এর জন্য কখনো দেখিনি পুলিশ আসতে, কখনো দেখিনি গ্রামের কেউ গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেছে। এ ঝঞ্ঝাট কে করে! তারা চিরদিন শুনে আসছে পুলিশ ঘাঁটাতে নেই,—তার ত্রিসীমানার মধ্যে যাওয়াও বিপজ্জনক। বাঘের মুখে পড়েও দৈবাৎ বাঁচা যায়, কিন্তু ওদের হাতে কদাচ নয়। কাজেই এ দৃশ্য যদি কারও চোখে পড়তো, সে চোখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে অন্যত্র সরে যেত। তারপরে রাত্রি এলে, শিয়লের দল বেরিয়ে মহা-সমারোহে ভোজনাদি শেষ করে নদীর জলে আঁচিয়ে মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে যেত—মড়ার চিহ্নমাত্র থাকত না।

একদিন আমার নিজেরও হয়তো ঐ দশা ঘটত কিন্তু ঘটতে পেলে না। সেই গল্পটা বলি।

আমার বয়স তখন বছর বারো। সকালে ছুটির দিনে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে ঘুড়ি তৈরি করচি, কানে গেল ও-পাড়ার নয়ন বাগদীর গলা। সে আমার ঠাকুরমাকে বলচে, গোটাপাঁচেক টাকা দাওনা দিদিঠাকরুন, তোমার নাতিকে দুধ খাইয়ে শোধ দেব।

ঠাকুরমা নয়নচাঁদকে বড় ভালবাসতেন, জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ টাকার দরকার হ'লো, নয়ন?

সে বললে, একটি ভাল গরু আনব, দিদি। বসন্তপুরে পিসীমার বাড়ি, পিস্তুত ভাই বলে পাঠিয়েছে, চার-পাঁচটি গরু সে রাখতে পারচে না, আমাকে একটি দেবে। কিছু নেবে না জানি, তবু গোটা-পাঁচেক টাকা সঙ্গে রাখা ভালো।

ঠাকুরমা আর কিছু না বলে পাঁচটা টাকা এনে তার হাতে দিলেন, সে প্রণাম করে চলে গেল।

আমি শুনেছিলাম বসন্তপুরে ভালো ছিপ পাওয়া যায়, সুতরাং নিঃশব্দে তার সঙ্গ নিলাম। মাইল-দুই কাঁচা পথ পেরিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বসন্তপুরে যেতে হয়। মাইল-খানেক গিয়ে কি জানি কেন হঠাৎ পিছনে চেয়ে নয়ন দেখে আমি। ভয়ানক রাগ করলে, বললে আমার জন্য সে দশখানা ছিপ কেটে আনবে, তবু কোনমতে আমি ফিরে যেতে রাজী হলাম না। অনেক কাকুতি-মিনতি করলাম, কিন্তু সে শুনলে না। আমাকে ধরে জোর করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। কান্নাকাটিতে ঠাকুরমা একটু নরম হলেন, কিন্তু নয়নচাঁদ কিছুতে সম্মত হ'লো না। বললে, দিদি, যেতে-আসতে কোশ-আষ্টেক পথ বৈ নয়, জোছনা রাত—স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু পথটা ভালো নয়, ভয় আছে। বেলাবেলি যদি ফিরতে না পারি, তখন একলা গরু সামলাবো, না ছেলে সামলাবো, না নিজেকে সামলাবো—কি করব বল ত, দিদি।

পথে ভয়টা যে কি তা এ অঞ্চলের সবাই জানে। ঠাকুরমা একেবারে বেঁকে দাঁড়ালেন, বললেন, না, কখনো না। যদি পালিয়ে যাস, তোর ইস্কুলের মাস্টারমশাইকে চিঠি লিখে পাঠাবো, তিনি পঞ্চাশ ঘা বেত দেবেন।

নিরুপায় হয়ে আমি তখন অন্য ফন্দি আঁটলাম। নয়ন চলে গেলে, পুকুরে নেয়ে আসি বলে তেল মেখে গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নদীর ধারে ধারে বনজঙ্গল ও আম-কাঁঠাল বাগানের ভিতর দিয়ে মাইল দুই-আড়াই ছুটতে ছুটতে যেখানটায় আমাদের কাঁচা রাস্তা এসে পাকা রাস্তায় মিলেছে সেইখানটায় এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনিট-দশেক পরে দেখি নয়ন আসচে। সে আমাকে দেখে প্রথমটা খুব বকলে, তারপর আমি কি করে এসেছি শুনে হেসে ফেললে। বললে, চলো ঠাকুর, যা অদেষ্টে আছে তাই হবে। এতদূর এসে আর ত ফিরতে পারিনে।

নয়নদা সাতগাঁর একটা দোকান থেকে মুড়ি-মুড়কি বাতাসা কিনে আমার কোঁচার খুঁটে বেঁধে দিলে, খেতে খেতে প্রায় দুপুরবেলা দু'জনে বসন্তপুরে এসে ওর পিসীর বাড়িতে পৌছলাম। পিসীর অবস্থা সচ্ছল। বাড়ির নীচেই কুন্তী নদী; ছোট, কিন্তু জল আছে, জোয়ার-ভাঁটা খেলে। স্নান করে এলাম, ওদের বড়বৌ কলাপাতায় চিঁড়ে গুড় দুধ কলা দিয়ে ফলারের যোগাড় করে দিলে। খাওয়া হলে নয়নের পিসী বললে, ছেলেমানুষ, চার-পাঁচ কোশ পথ হেঁটে এসেছে, আবার যেতে হবে। এখন শুয়ে একটু ঘুমুক তার পরে বেলা পড়লে যাবে। তার ছোট ছেলে ছিপ কেটে আনতে গেল।

নয়ন আর আমি দু'জনেই পথ হেঁটে এমনি ক্লান্ত হয়েছিলাম যে আমাদের ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন চারটে বেজে গেছে। বেলার দিকে চেয়ে নয়নদা একটু চিন্তিত হ'লো, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। মিনিট-দশেকের

মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় সে প্রণামী বলে পিসীকে টাকা-পাঁচটা দিতে গেল ; কিন্তু তিনি নিলেন না, ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, তোর ছেলেমেয়েদের বাতাসা কিনে দিস।

আমার কাঁধে ছিপের তাড়া, নয়নের বাঁ হাতে গরুর দড়ি, ডান হাতে চার হাত লম্বা বাঁশের লাঠি। কিন্তু গরু নিয়ে দ্রুত চলা যায় না, কোশ-দুই না যেতেই সন্ধ্যা উতরে আকাশে চাঁদ দেখা দিলে। রাস্তার দু'ধারেই বড় বড় অশত্থ বট আর পাকুড় গাছ ডালে ডালে মাথায় মাথায় ঠেকে এক হয়ে আছে। পথ অন্ধকার, শুধু কেবল পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোছনার ম্লান আলো স্থানে স্থানে পথের উপরে এসে পড়েছে। নয়ন বললে, দাদাভাই, তুমি আমার বাঁ দিকে এসে, তোমার বাঁ হাতে গরুর দড়িটা ধরো, আমি থাকি তোমার ডাইনে।

কেন নয়নদা ?

না, এমনি। চলো যাই।

আমি ছেলেমানুষ হলেও বুঝতে পারলাম নয়নদার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ।

ক্রমশঃ, পাকা রাস্তা ছেড়ে আমরা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লাম। দু'পাশের বনজঙ্গল আরও ঘন হয়ে এলো, বহু প্রাচীন সুবৃহৎ পাকুড়গাছের সারি মাথার উপরে পাতার অবিচ্ছিন্ন আবরণে কোথাও ফাঁক রাখেনি যে একটু চাঁদের আলো পড়ে। সন্ধ্যায় কৃষাণ-বালকেরা এই পথে গরুর পাল বাড়ি নিয়ে গেছে, তাদের খুরের ধূলো এখনও নাকেমুখে ঢুকছে, এমন সময়ে সমুখে হাত পঞ্চাশ-ষাট দূরে বিদীর্ণ কণ্ঠের ডাক এলো-বাবা গো, মেরে ফেললে গো। কে কোথায় আছো রক্ষে করো ! সঙ্গে সঙ্গে লাঠির ধুপধাপ শব্দ। তার পরে সমস্ত নীরব।

নয়নদা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, যাঃ—শেষ হয়ে গেল।

কি শেষ হ'লো নয়নদা ?

একটা মানুষ। বলে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সে কি ভাবলে, তার পরে বললে, চলো, দাদাভাই, আমরা একটু সাবধানে যাই।

গরু বাঁয়ে, নয়নদা ডাইনে, আমি উভয়ের মাঝখানে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসচি, দেখেও আসচি মাঝে মাঝে, সুতরাং বালক হলেও বুঝলাম সমস্ত। "কে কোথায় আছো রক্ষে করো !" তখনও বাজচে—ভয়ে ভয়ে বললাম, নয়নদা ওরা যে সব সামনে দাঁড়িয়ে, আমরা যাবো কি করে ? মারে যদি—

না, দাদাভাই, আমি থাকতে মারবে না। ওরা ঠ্যাঙাড়ে কিনা—আমাদের দেখলেই পালাবে। ওরা ভারী ভীতু।

গরু, আমি ও নয়নচাঁদ তিনজনে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। ভয়ে আমার পা কাঁপচে—নিশ্বাস ফেলতে পারিনে এমন অবস্থা। গাছের ছায়া আর ধূলোর আঁধারে এতক্ষণ দেখা যায়নি কিছুই, পনেরো-বিশ হাত এগিয়ে আসতেই চোখে পড়লো জন পাঁচ-ছয় লোক যেন ছুটে গিয়ে পাকুড় গাছের আড়ালে লুকোলো। নয়নদা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁক দিলে—সে কি ভয়ানক গলা—বললে, খবরদার বলচি তোদের। বামুনের ছেলে সঙ্গে আছে—পাব্‌ড়া ছুঁড়ে মারলে তোদের একটাকেও জ্যান্ত রাখবো না—এই সাবধান করে দিলাম।

কেউ জবাব দিলে না। আমরা আরো খানিকটা এগিয়ে এসে দেখি একটা লোক উপুড় হয়ে রাস্তার ধূলোয় পড়ে। অল্প-স্বল্প চাঁদের আলো তার গায়ে লেগেছে,—নয়নদা ঝুঁকে দেখে হায় হায় করে উঠলো ! তার নাক দিয়ে কান দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়চে, শুধু পা দুটো তখনও থরথর করে কাঁপচে ! কাঁধের ভিক্ষের ঝুলিটি তখনও কাঁধে। কিন্তু চালগুলি ছড়িয়ে পড়েছে ধূলোয়। হাতের একতারাটি লাঠির ঘায়ে ভেঙ্গেচুরে খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে আছে।

নয়নদা সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বললে, ওরে নারকী, নরকের কীট। তোরা মিছিমিছি একজন বৈষ্ণবের প্রাণ নিলি ? এ তোরা করেছিস কি ! তার ক্ষণেক পূর্বে ভীষণ কণ্ঠ সহসা যেন বেদনায় ভরে গেল।

কিন্তু ওদিক থেকে সাড়া এল না। নয়নের এ দুঃখের প্রধান হেতু সে নিজে পরম বৈষ্ণব। তার গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা, নাকে তিলক, সর্বাঙ্গে নানাবিধ ছাপছোপ। বাড়িতে তার একটি ছোট ঠাকুরঘর আছে, সেখানে মহাপ্রভুর শ্রীপট প্রতিষ্ঠিত। সরস্রবার ইষ্টনাম জপ না করে সে জলগ্রহণ করে না। ছেলেবেলায় পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয় হয়েছিল, এখন নিজের চেষ্টায় বড় অক্ষরে ছাপা বই অনায়াসে পড়তে পারে। প্রদীপের আলোকে ঠাকুরঘরে বসে বটতলার প্রকাশিত বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে সুর করে পড়ে। মাংস সে খায় না, সঙ্কল্প আছে, ভবিষ্যতে একদিন মাছ পর্যন্ত ছেড়ে দেবে।

তার বৈষ্ণব হবার ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে, এখানে সেটুকু বলে রাখি। এখন তার বয়স চল্লিশের কাছে, কিন্তু যখন পঁচিশ-ত্রিশ ছিল, তখন ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে সে একবার বছর-খানেক হাজত-বাস করে। ঠাকুরমার এক পিসতুতো ভাই ছিলেন জেলার বড় উকিল, তাঁকে দিয়ে বহু তদ্বির ও অর্থব্যয় করে ঠাকুরমা ওকে খালাস করেন। হাজত থেকে বেরিয়েই সে সোজা নবদ্বীপ চলে যায় এবং তথায় কোন এক গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে, মাথা মুড়িয়ে, তুলসীর মালা ধারণ করে সে দেশে ফিরে আসে। সেদিন থেকে সে গোঁড়া বৈষ্ণব। নয়ন যখন তখন এসে আমার ঠাকুরমাকে ভূমিষ্ট প্রণাম করে যেত। ব্রাহ্মণের বিধবা স্পর্শ করার অধিকার নেই, যে-কোন একটি গাছের পাতা ছিঁড়ে তাঁর পায়ের কাছে রাখত, তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলটি ছুঁইয়ে দিলেই, সেই পাতাটি সে মাথায় গলায় বারবার বুলিয়ে বলত, দিদিঠাকরুন আশীর্বাদ করো যেন এবার মরে সৎ জাত হয়ে জন্মাই, যেন হাত দিয়ে তোমার পায়ের ধূলো মাথায় রাখতে পারি। ঠাকুরমা সস্নেহে হেসে বলতেন, নয়ন, আমার আশীর্বাদে তুই এবার বামুন হয়ে জন্মাবি।

নয়নের চোখ সজল হয়ে উঠত, বলত, অত আশা করিনে দিদি, পাপের আমার শেষ নেই, সে-কথা আর কেউ না জানুক, তুমি জানো। তোমার কাছে কিছু গোপন করিনি।

ঠাকুরমা বলতেন, সব পাপ তোর ক্ষয় হয়ে গেছে নয়ন। তোর মত ভক্তিমান, ভগবৎ-বিশ্বাসী ক'জন সংসারে আছে! এ-পথ কখনো ছাড়িস নে রে, পরকালের ভাবনা নেই তোর।

নয়ন চোখ মুছতে মুছতে চলে যেত, ঠাকুরমা হেঁকে বলতেন, কাল দুটি প্রসাদ পেয়ে যাস নয়ন, ভুলিস নে যেন।

এ-সব আমি নিজের চোখে কতবার দেখেচি। সুতরাং যে-বৈষ্ণবের সে প্রাণপণে সেবা করে, তার হত্যায় ও যে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বললে,—নিরীহ বোষ্টম ভিক্ষে করে সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরছিল, ওর কাছে কি পাবি যে মেরে ফেললি বল তো? দু'গণ্ডা চার গণ্ডার বেশী ত নয়। ইচ্ছে করে তোদেরও এমনি ঠেঙিয়ে মারি।

এবার গাছের আড়াল থেকে জবাবা এলো—দু'গণ্ডা চার গণ্ডাই বা দেয় কে রে? তোর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে এ যাত্রা বেঁচে গেলি। ধর্মকথা শোনাতে হবে না—পালা—পালা—

কথা তার শেষ না হতেই নয়ন যেন বাঘের মত গর্জে উঠল—বটে রে হারামজাদা! পালাবো? তোদের ভয়ে! তখন ট্যাঁক থেকে পঁচটা টাকা বার করে এ-হাতের টাকা ঝনঝন করে ও-হাতের মুঠোয় নিয়ে বললে,—এতগুলো টাকার মায়া ছাড়িস নে বলে দিলাম। পারিস, সবাই একসঙ্গে এসে নিয়ে যা। কিন্তু ফের সাবধান করে দিই—আমার বাবাঠাকুরের গায়ে যদি কুটোর আঁচ লাগে ত তোদের সব ক'টাকে জন্মের মতো রাস্তায় শুইয়ে রেখে তবে ঘরে যাবো। শেত্লার নয়ন ছাতি আমি—আর কেউ নয়। বলি, নাম শুনেছিস, না এমনিই লাঠি হাতে ভিখিরী মেরে বেড়াস্? হারামজাদা শেয়াল-কুকুরের বাচ্চারা।

গাছের তলা একেবারে স্তব্ধ। মিনিট দুই স্থির থেকে নয়ন পুনরায় অধিকতর কটু সম্ভাষণে হাঁক দিলে—কি রে—আসবি, না টাকাগুলো ট্যাঁকে নিয়েই ঘরে যাবো?

কোন জবাব নেই। পথের উপরে দু-তিন গাছা পাব্ড়া পড়ে ছিলো, নয়ন একে একে কুড়িয়ে সেগুলো সংগ্রহ করে বললো,—চলো দাদা, এবার ঘরে যাই। রাত হয়ে এলো, তোমার ঠাকুরমা হয়ত ভাবছেন। ওরা সব শিয়াল-কুকুরের ছানা বৈ ত নয়, মানুষের কাছে আসবে কেন? তুমি একগাছা ছিপ-হাতে ভেমে গেলেও সবাই ছুটে পালাবে দাদাভাই।

ইতিমধ্যেই আমার ভয় ঘুচে সাহস বেড়ে গিয়েছিল, বললাম,—যাবো তেড়ে নয়নদা?

নয়ন হেসে ফেললে। বললে,—থাক্গে দাদা, কাজ নেই। কামড়ে দিতে পারে।

আমরা আবার পথ চলতে লাগলাম। নয়নের মুখে কথা নেই, আমার একটা প্রশ্নেরও সে হাঁ-না ছাড়া জবাব দেয় না। খানিকটা এগিয়েই একটা বড় গাছতলার অন্ধকার ছায়ায় এসে সে থমকে দাঁড়াল, বলল,—না দাদাভাই, চোখে দেখে ছেড়ে যাওয়া হবে না। বামুন-বোষ্টমের প্রাণ নেওয়ার শোধ আমি দেবো।

কি করে শোধ দেবে নয়নদা?

এক ব্যাটাকেও কি ধরতে পারবো না? তখন দু'জনে মিলে তারেও ঠেঙিয়ে মারবো।

ঠেঙিয়ে মারার আনন্দে আমি প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠলাম। একটা নতুন ধরনের খেলার মত। ওদের

সম্বন্ধে কত ভয়ঙ্কর কথাই না শুনেছিলাম ; কিন্তু সব মিছে। নয়নদা যেতে দিলে না, নইলে আমিই তেড়ে গিয়ে নিশ্চয়ই একটাকে ধরে ফেলতে পারতাম ! বললাম,—নয়নদা, তুমি বেশ করে এক ব্যাটাকে ধরে থেকো, আমি একাই ঠেঙিয়ে মারবো। কিন্তু আমার ছিপ যদি ভেঙ্গে যায় ?

নয়ন পুনরায় হেসে বললে,—ছিপের ঘায়ে মরবে না দাদা, এই লাঠিটা নাও, বলে সে সংগৃহীত পাব্‌ড়ার একগাছা আমার হাতে দিয়ে বললে, —গরু নিয়ে এইখানে একটু দাঁড়াও দাদাভাই, আমি এখুনি দু'এক ব্যাটাকে ধরে আনচি। কিন্তু চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুনে ভয় পেয়ো না যেন।

নাঃ ভয় কি ! এই যে হাতে লাঠি রইল।

নয়ন বাকী পাব্‌ড়া দুটো বগলে চেপে ধরলে, তার বড় লাঠিটা রইল ডান হাতে, তার পরে রাস্তা ছেড়ে বনের ধার ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে চলল সেইদিকে। ঠেঙাড়েরা ঠাউরেছিল আমরা চলে গেছি। নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসে সেই মৃত ভিখিরীর ট্যাঁক হাতড়ে, ঝুলি ঝেড়ে তারা খুঁজে দেখছিল কি আছে।

হঠাৎ একজনের চোখে পড়লো অনতিদূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নয়ন। সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো,—কে দাঁড়িয়ে ওখানে ?

—আমি নয়ন ছাতি। অমনি দাঁড়িয়ে থাক্, ছুটে পালাবি কি মরবি।

কিন্তু, কথা শেষ না হতেই অনেকগুলো পায়ের ছুটোছুটি শুনতে পেলাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট আর্তস্বরে কেঁদে উঠে কে যেন হুড়মুড় করে একটা ঝোপের উপর পড়ে গেল।

নয়ন চেঁচিয়ে বললে—এক ব্যাটারে পেয়েচি দাদাভাই, আরগুলো পালালো।

শুভ সংবাদে সেইখানে দাঁড়িয়ে লাফাতে লাগলাম। আমি চেঁচিয়ে বললাম,—ওরে ধরে আনো নয়নদা, আমি ঠেঙিয়ে মারব। তুমি মেরে ফেলো না যেন।

—না দাদা, তুমিই মেরো।

আবার একটা করুণ ধ্বনি কানে এলো, বোধ করি নয়নের লাঠির খোঁচার ফল। মিনিট-দুই পরে দেখি একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসচে, তার পিছনে নয়নচাঁদ। কাছে এসে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠে আমার পা জড়িয়ে ধরলে। নয়ন টান মেরে তারে তুলে দাঁড় করালে। এখন তার মূর্তি দেখে আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। মুখে তার কালি মাখানো, তাতে সাদা চুনের ফোঁটা দেওয়া। যেমন রোগা তেমনি লম্বা, পরনে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া। তখনও কাঁদছিল। তার গালে নয়ন প্রচণ্ড এক চড় মেরে বললে,—চুপ কর্ হারামজাদা ! যা জিজ্ঞাসা করি সত্যি জবাব দে। ক'জন ছিলি ? তাদের কি নাম, কোথায় ঘর বল্ ?

লোকটা প্রথমে বলতে চায় না, কিন্তু পিঠে একটা গুঁতো খেয়ে সঙ্গীদের নাম-ধাম, গড়গড় করে বলে গেল।

নয়ন বললে,—মনে থাকবে, ভুলবো না। এখন বল্, বোষ্টমঠাকুর পড়ে গেলে নিজে তুই ক'ঘা বাড়ি দিয়েছিলি ?

পাঁচ-সাত ঘা হবে বোধ হয়।

নয়নচাঁদ দাঁত কড়মড় করে বললে, আচ্ছা,—পাঁচ-সাত ঘা-ই সই। এবার তেমনি করে শো, যেমন করে বোষ্টম ঠাকুরকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। দাদাভাই, এগিয়ে এসো,—ঐ খেঁটে দিয়ে পাঁচ-সাত ঘায়েই সাবাড় করা চাই কিন্তু। দেখবো কেমন হাতের জোর। তুই ব্যাটা দেরি করচিস্ কেন ? শুয়ে পড়—বলেই তার কান ধরে টেনে রাস্তায় বসালে। এবং নিজে সে শোবার পূর্বেই প্রচণ্ড গোটা দুই-তিন লাথি পিঠে মেরে পথের ধূলোর পরে লুটিয়ে দিলে। বললে,—দেরি ক'রো না দাদা, মাথা তাক করে মারো। দু-তিন ঘার বেশী লাগবে না।

নয়নদার গলার স্বর গেল বদলে, চোক-মুখ যেন আর কার। চেহারা দেখে গায়ে কাঁটা দিলে, নতুন খেলা শুরু করবো কি, ভয়ে হাত-পা কাঁপতে লাগল, কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললাম,—আমি পারবো না, নয়নদা।

পারবে না ? তবে আমিই শেষ করে দিই।

না নয়নদা, না, মেরো না।

কিন্তু, লোকটা লাথি খেয়ে সেই শুয়ে পড়েছিল, আর নড়েচড়েনি। প্রাণভিক্ষেও চায়নি—একটা কথা পর্যন্ত না।

বললাম,—চলো. ওরে বেঁধে নিয়ে থানায় ধরিয়ে দিই গে।

শুনে নয়নদা যেন চমকে উঠল ? থানায় ? পুলিশের হাতে ?

হাঁ। ও যেমন মানুষ মেরেছে, তারাও তেমনি ওকে ফাঁসি দিক। যেমন কর্ম তেমন ফল।

নয়ন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পরে তার একটা লাঠির ঠেলা দিয়ে বললে,—ওরে ওঠ্।

কিন্তু সাড়া নেই। নয়ন বললে, ব্যাটা মরে গেল নাকি ? যে দুর্বল সিং—দু'দিন হয়ত পেটে একমুঠো অন্নও নেই—আবার পথে এসেছে লোক ঠাঙাতে। যা ব্যাটা দূর হ। উঠে ঘরকে যা।

সে কিন্তু তেমনিই রইল পড়ে। নয়ন তখন হেঁট হয়ে তার নাকে হাত দিয়ে বললে, না মরেনি। অজ্ঞান হয়ে আছে। জ্ঞান হলে আপনিই ঘরে যাবে। চল দাদা, আমরাও ঘরে যাই। অনেক দেরি হয়ে গেল, ঠাকুরমা ভাবচে।

পথে যেতে যেতে বললাম, কেন ছেড়ে দিলে নয়নদা, পুলিশে ধরিয়ে দিলে বেশ হতো।

কেন দাদাভাই ?

বেশ ফাঁসি হয়ে যেত। খুন করলে ফাঁসি হয় আমাদের পাড়ার বইয়ে লেখা আছে।

আছে নাকি দাদা।

আছে বৈ কি। চলো না বাড়ি গিয়ে তোমাকে বই খুলে দেখিয়ে দেব।

নয়ন বিস্ময়ের ভান করে বললে, বলো কি দাদা, একটা মানুষ মারার বদলে আর একটা মানুষ মারা ?

হাঁ, তাই ত। সেই ত তার উচিত সাজা। আমরা পড়েছি যে!

নয়ন একটুখানি হেসে বলল,—কিন্তু, সব উচিতই যে সংসারে হয় না, দাদাভাই।

কেন হয় না নয়নদা ?

নয়ন হঠাৎ জবাব দিলে না, একটু ভেবে বললে,—বোধ হয় জগতে সবাই ধরিয়ে দিতে পারে না বলে।

কেন যে পারে না, কেন যে মানুষে এ অন্যায় করে, সে তত্ত্ব সেদিনও জানিনি, আজও না। তবু, এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে খানিকটা পথ চলার পরে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা নয়নদা, ওরা ফিরে গিয়ে আবার ত মানুষ মারবে ?

নয়ন বললে, না দাদা, আর মারবে না! আমি বেঁচে থাকতে এ কাজ ওরা আর কখনো করবে না।

জবাবটায় বেশ প্রসন্ন হতে পারলাম না। ফাঁসি হওয়াই ছিল আমার মনঃপুত। বললাম,—কিন্তু ওরা বেঁচে ত গেল। শাস্তি ত হ'লো না।

নয়ন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল, বললে,—কি জানি,—হবে হয়তো একদিন। পরক্ষণে সচেতন হয়ে বললে,—আমি ত এর উত্তর জানিনে দাদাভাই, তোমার ঠাকুরমা জানেন। তুমি বড় হয়ে তাঁকে একদিন জিজ্ঞেসা ক'রো।

আমার কিন্তু বড় হবার সবুর সইল না, বাড়িতে পা দিয়েই সমস্ত বিবরণ, শুধু হাঁত-পা কাঁপার অবান্তর কথাগুলো বাদ দিয়ে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথোচিত সঞ্চালনে আমাদের ঠাঙাড়ে-বিজয় কাহিনী বর্ণনা করে ঠাকুরমাকে সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলাম—গরু কিনতে গিয়ে আজ কি কাণ্ড ঘটেছিল। আগাগোড়া মন দিয়ে শুনে তিনি কেবল একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

নয়ন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। আমার বলা শেষ হতে টাকা-পাঁচটি ঠাকুরমার পায়ের কাছে রেখে বললে,—গরুটা এমনিই পেলাম। তোমার টাকা তোমার কাছেই ফিরে এল দিদি। না নিলেন পিসীমা, না নিলে তোমার মেজবৌয়ের ভাইদের দল পথে।

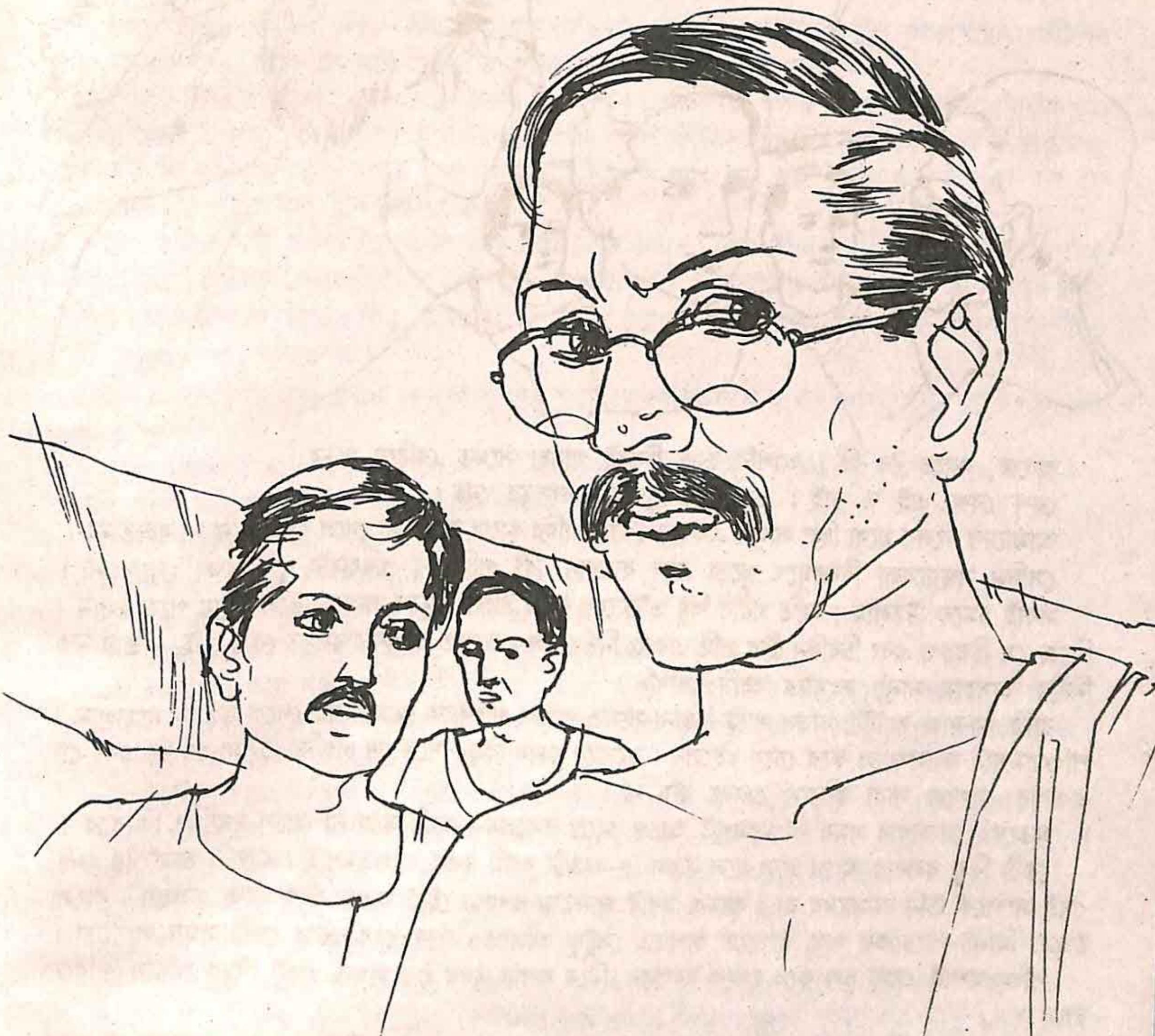
ঠাকুরমা একটু হেসে বললেন, দেখা হলে মেজবৌকে জানাব। কিন্তু ও টাকা আমিও নেবো না নয়ন। ও তোর ঠাকুরের ভোগে লাগাগে যা। কিন্তু একটা কথা আজ তোকে বলি নয়ন, এখনো তেমন বোষ্টম হতে তুই পারলি নে।

কেন দিদি ?

তারা কি টাকা বাজিয়ে লোক ভোলায় ? ধর্ যদি লোভ সামলাতে না পেরে ছুটেই আসত ?

তাহলে আরও গোটা পাঁচ-ছয় মরত। তাতে নয়নের পাপের ভরায় কতটুকুই বা ভার চাপত, দিদি ?

ঠাকুরমা চুপ করে রইলেন। এ ইঙ্গিতের অর্থ জানেন তিনি, আর জানে নয়ন নিজে। কিন্তু সেও আর কিছু বললে না। দূর থেকে তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে টাকা-পাঁচটি মাথায় ঠেকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।



লালুর শবযাত্রা

আমাদের শহরে তখন শীত পড়েছে, হঠাৎ কলেরা দেখা দিলে। তখনকার দিনে ওলাউঠার নামে মানুষে ভয়ে হতজ্ঞান হ'তো। কারও কলেরা হয়েছে শুনতে পেলে সে-পাড়ায় মানুষ থাকতো না। মারা গেলে দাহ করার লোক মেলা দুর্ঘট হ'তো। কিন্তু সে দুর্দিনেও আমাদের ওখানে একজন ছিলেন যাঁর কখনো আপত্তি ছিল না। গোপালখুড়ো তাঁর নাম, জীবনের ব্রত ছিল মড়া-পোড়ানো। কারও অসুখ শক্ত হয়ে উঠলে তিনি ডাক্তারের কাছে প্রত্যহ সংবাদ নিতেন। আশা নেই শুনলে খালি পায়ে গামছা কাঁধে তিনি ঘন্টা-দুই পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হতেন। আমরা জনকয়েক ছিলাম তাঁর চ্যালা। মুখ ভার করে বলে যেতেন,—ওরে, আজ রাত্রিটা একটু সতর্ক থাকিস, ডাকলে যেন সাড়া পাই। রাজদ্বারে শ্মশানে চ—শাস্ত্রবাক্য মনে আছে ত?



আজ্ঞে, আছে বৈ কি। আপনি ডাক দিলেই গামছা সমেত বেরিয়ে পড়ব।

বেশ বেশ, এই ত চাই। এর চেয়ে পুণ্যকর্ম সংসারে নেই।

আমাদের দলের মধ্যে ছিল লালুও একজন। ঠিকেদারির কাজে বাইরে না গেলে সে কখনো না বলত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিষণ্ণমুখে খুড়ো এসে বললেন, বিষ্টু পণ্ডিতের পরিবারটা বুঝি রক্ষা পেলে না।

সবাই চমকে উঠলাম। অতি গরীব বিষ্টু ভট্চাযের কাছে বাংলা ইস্কুলে আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। নিজে সে চিররুগ্ন এবং চিরদিন স্ত্রীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল। জগতে আপনার বলতে কেউ নেই,—তার মত নিরীহ অসহায় মানুষ সংসারে আমি দেখিনি।

রাত্রি আন্দাজ আটটা, দড়ির খাটে বিছানা-সমেত পণ্ডিত-গৃহিণীকে আমরা ঘর থেকে উঠানে নামালাম। পণ্ডিতমশাই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। সংসারে কোন-কিছুর সঙ্গে সে চাহনির তুলনা হয় না এবং সে একবার দেখলে সারা জীবনে ভোলা যায় না।

মৃতদেহ তোলবার সময় পণ্ডিতমশাই আস্তে আস্তে বললেন—আমি সঙ্গে না গেলে মুখাগ্নির কি হবে?

কেউ কিছু বলবার আগে লালু বলে উঠল, ও-কাজটা আমি করব, পণ্ডিতমশাই। আপনি আমাদের গুরু, সেই সম্পর্কে উনি আমাদের মা। আমরা সবাই জানতাম শ্মশানে হেঁটে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বাংলা ইস্কুল মিনিট-পাঁচেকের পথ, হাঁপাতে হাঁপাতে সেটুকু আসতেও তাঁর আধ-ঘন্টার বেশী সময় লাগতো।

পণ্ডিতমশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, নিয়ে যাবার সময় ওঁর মাথায় একটু সিঁদুর পরিয়ে দিবিনে লালু?

নিশ্চয় দেব, পণ্ডিতমশাই,—নিশ্চয় দেব, বলে এক লাফে সে ঘরে ঢুকে কৌটো বার করে আনলে এবং যত সিঁদুর ছিল সমস্তটা মাথায় ঢেলে দিলে।

'হরিবোল' দিয়ে আমরা গৃহ হতে গৃহিনীর মৃতদেহ চিরদিনের মত বার করে নিয়ে এলাম,—পণ্ডিতমশাই খোলা দোরের চৌকাঠে হাত দিয়ে তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গঙ্গার তীরে শ্মশান অনেক দূর, প্রায় ক্রোশ-তিনেক। সেখানে পৌঁছে যখন আমরা শব নামালাম, তখন রাত দুটো। লালু খাট ছুঁয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল। কেউ কেউ যেখানে-সেখানে শ্রান্তিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। শুক্লাদ্বাদশীর পরিস্ফুট জোৎস্নায় বালুময় বহুদূর-বিস্তৃত শ্মশান অত্যন্ত জনহীন। গঙ্গার ওপার থেকে কনকনে উত্তরে হাওয়ায় জলে ঢেউ উঠেছে, তার কোন-কোনটা লালুর পায়ের প্রায় নীচে পর্যন্ত আছাড় খেয়ে-খেয়ে পড়ছে। শহর থেকে গরুর গাড়িতে পোড়াবার কাঠ আসে, কি জানি সে কতক্ষণে পৌঁছবে। আধ-ক্রোশ দূরে পথের ধারে ডোমদের বাড়ি; আসার সময়ে আমরা তাদের হাঁক দিয়ে এসেছি, তাদের আসতেই বা না-জানি কত দেরি।

সহসা গঙ্গার ওপারে দিগন্তে একটা গাঢ় কালো মেঘ উঠে প্রবল উত্তরে হাওয়ায় হুহু করে সেটা এপারে ছুটে আসতে লাগল। গোপালখুড়ো সভয়ে বললেন, লক্ষণ ভালো ঠেকচে না রে,—বৃষ্টি হতে পারে। এই শীতে জলে ভিজলে আর রক্ষে থাকবে না।

কাছে আশ্রয় কোথাও নেই,—একটা বড় গাছ পর্যন্ত না। কতকটা দূরে ঠাকুরবাড়ির আমবাগানে মালীদের ঘর আছে বটে, কিন্তু অতখানি ছোটা ত সহজ নয়।

দেখতে দেখতে আকাশ গেল ছেয়ে, চাঁদের আলো ডুবল অন্ধকারে, ওপার থেকে বৃষ্টিধারার সোঁসোঁ শব্দ এলো কানে, ক্রমশঃ সেটা নিকটতর হয়ে উঠল। আগাম দু-দশ ফোঁটা সকলেরই গায়ে এসে পড়ল তীরের মত, কি-করি কি-করি ভাবতে-ভাবতেই মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে এলো। মড়া রইল পড়ে, প্রাণ বাঁচাতে কে যে কোথায় ছুট দিলে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

জল থামলে ঘন্টা-খানেক পরে একে একে সবাই ফিরে এলাম। মেঘ গেছে কেটে, চাঁদের আলো ফুটেছে দিনের মত। ইতিমধ্যে গরুর গাড়ি এসে পৌছেচে, গাড়োয়ান কাঠ ও শবদাহের অন্যান্য উপকরণ নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার উদ্যোগ করচে। কিন্তু ডোমদের দেখা নেই। গোপালখুড়ো বললেন, ও-ব্যাটারা ঐ রকম। শীতে ঘর থেকে বেরুতে চায় না।

মণি বললে, কিন্তু লালু এখনো ফিরলো না কেন ? সে যে বলছিল মুখে আগুন দেবে। ভয়ে বাড়ি পালালো না ত ?

খুড়ো লালুর উদ্দেশে রাগ করে বললেন, ওটা ঐ-রকম। যদি এতই ভয়, মড়া ছুঁয়ে বসতে গেলি কেন ? আমি হলে বজ্রাঘাত হলেও মড়া ছেড়ে যেতাম না।

ছেড়ে গেলে কি হয় খুড়ো ?

কি হয় ? কত-কি ? শ্মশানভূমি কিনা !

শ্মশানে একলা বসে থাকতে আপনার ভয় করত না ?

ভয় ! আমার ? অন্ততঃ হাজারটা মড়া পুড়িয়েছি জানিস !

এর পরে মণি আর কথা কইতে পারলে না। কারণ সত্যই খুড়োর গর্ব করা সাজে। শ্মশানে গোটা-দুই কোদাল পড়েছিল, খুড়ো তার একটা তুলে নিয়ে বললেন, আমি চুলোটা কেটে ফেলি, তোরা হাতাহাতি করে কাঠগুলো নীচে নামিয়ে ফেল।

খুড়ো চুলি কাটচেন, আমরা কাঠ নামিয়ে আনচি ; নরু বললে, আচ্ছা, মড়াটা ফুলে যেন দুগুণ হয়েছে, না ?

খুড়ো কোনদিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন, ফুলবে না ? লেপ-কাঁথা সব জলে ভিজেছে যে !

কিন্তু তুলো জলে ভিজলে ত চুপসে ছোট হয়ে যাবে খুড়ো, ফুলবে না ত।

খুড়ো রাগ করে উঠলেন,—তোর ভারী বুদ্ধি। যা করচিস্ কর।

কাঠ বহা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

নরুর দৃষ্টি ছিল বরাবর খাটের প্রতি। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে,—খুড়ো, মড়া যেন নড়ে উঠল।

খুড়োর হাতের কাজ শেষ হয়েছিল, কোঁদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, তোর মত ভীতু মানুষ আমি কখনো ত দেখিনি নরু ! তুই আসিস কেন এ-সব কাজে ? যা—বাকী কাঠগুলো আন। আমি চিতাটা সাজিয়ে ফেলি। গাধা কোথাকার !

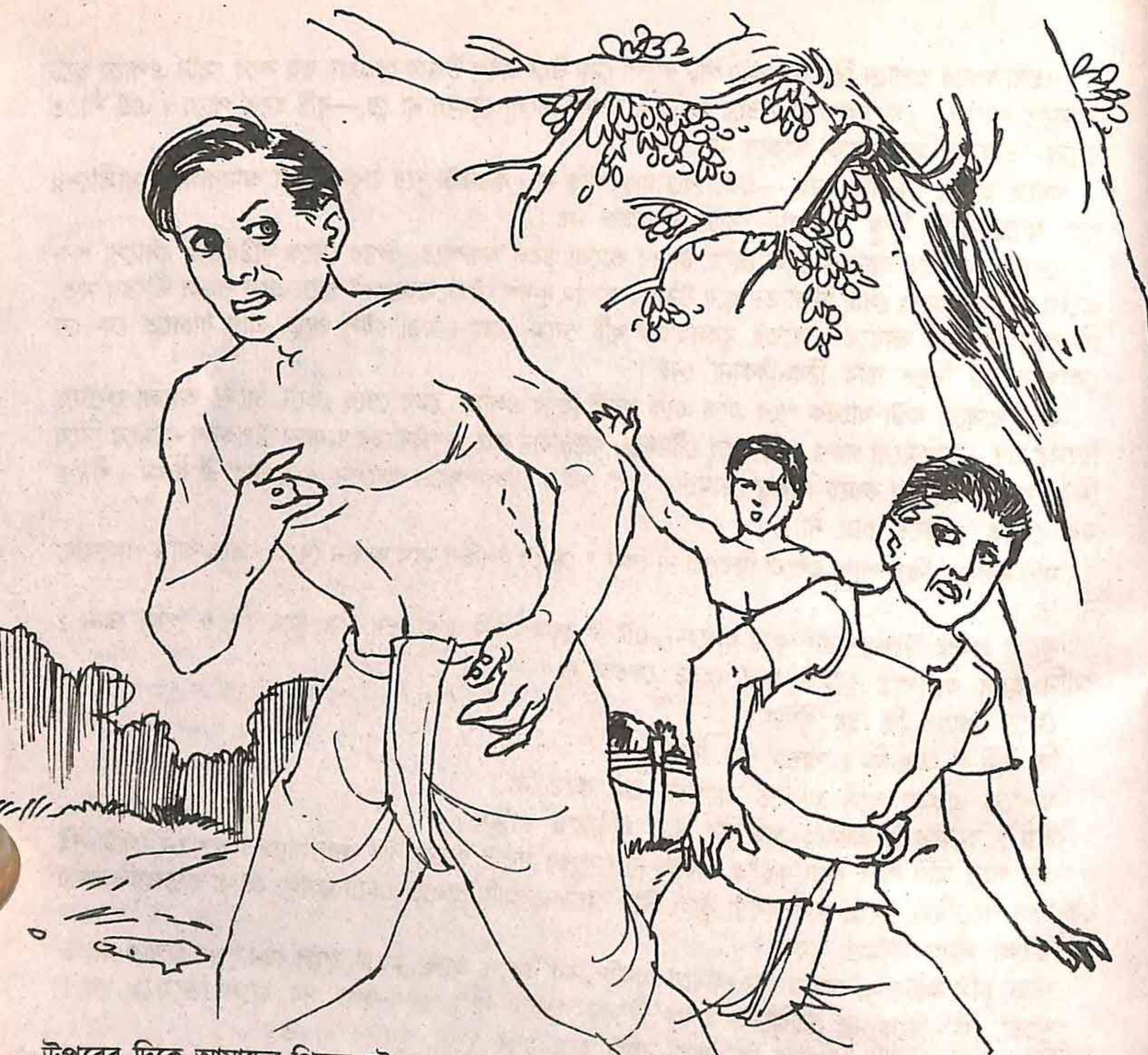
আবার মিনিট-দুই গেল। এবার মণি হঠাৎ চমকে উঠে পাঁচ-সাত পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে সভয়ে বললে, না খুড়ো গতিক ভালো ঠেকছে না। সত্যিই মড়াটা যেন নড়ে উঠলো।

খুড়ো এবারে হাঃ হাঃ—করে হেসে বললেন, ছোঁড়ার দল—তোরা ভয় দেখাবি আমাকে ? যে হাজারের উপর মড়া পুড়িয়েছে—তাকে ?

নুরু বললে, ঐ দেখুন আবার নড়চে।

খুড়ো বললেন, হাঁ নড়চে, ভূত হয়ে তোকে খাবে বলে—মুখের কথাটা তাঁর শেষ হ'লো না, অকস্মাৎ লেপকাঁথা জড়ানো মড়া হাঁটু গেড়ে খাটের উপর বসে ভয়ঙ্কর বিশ্রী খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো,—নাঁ নাঁ—নঁরুকে নাঁ—গোঁপালকেঁ খাঁবো—

ওরে বাবা রে ! আমরা সবাই মারলাম উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। গোপালখুড়োর সুমুখে ছিল কাঠের স্তূপ, তিনি



উপরের দিকে আমাদের পিছনে ছুটতে না পেরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে। সেই কনকনে ঠাণ্ডা একবুক জলে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন—বাবা গো, গেছি গো—ভূতে খেয়ে ফেললো গো! —রাম—রাম—রাম—

এদিকে সেই ভূতও তখন মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল—ওরে নির্মল, ওরে মণি, ওরে নরু, পালাস না রে—আমি লালু—ফিরে আয়—ফিরে আয়—

লালুর কণ্ঠস্বর আমাদের কানে পৌঁছলো। নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে সবাই ফিরে এলাম। গোপালখুড়ো শীতে কাঁপতে কাঁপতে ডাঙ্গায় উঠলেন। লালু তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে সলজ্জে বললে, সবাই জলের ভয়ে পালাল, কিন্তু আমি মড়া ছেড়ে যেতে পারলাম না, তাই লেপের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম।

খুড়ো বললেন, বেশ করেছিলে, বাবা, খাসা বুদ্ধি করেছিলে। এখন যাও, ভাল করে গঙ্গামাটি মেখে চান করো গে। এমন শয়তান ছেলে আমি আমার জন্মে দেখিনি—

তিনি কিন্তু মনে মনে তাকে ক্ষমা করলেন। বুঝলেন, এতবড় ভয়শূন্যতা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। এই রাতে একাকী শ্মশানে কলেরার মড়া, কলেরার বিছানা—এ-সব সে গ্রাহ্যই করলে না!

মুখে আগুন দেবার কথায় খুড়ো আপত্তি করলেন, না, সে হবে না। ওর মা শুনতে পেলে আর আমার মুখ দেখবেন না।

শবদাহ সমাধা হ'লো। আমরা গঙ্গায় স্নান সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সেইমাত্র সূর্যোদয় হয়েছে।

দেওঘরের স্মৃতি

চিকিৎসকের আদেশে দেওঘরে এসেছিলাম বায়ু পরিবর্তনের জন্যে। আসার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা বারংবার মনে হয়েছিল—

ওষুধে ডাক্তারে—
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়
—করলে যখন অস্থি জর জর
তখন বললে হাওয়া বদল করো।

বায়ু পরিবর্তনে সাধারণতঃ যা হয় সে-ও লোকে জানে, আবার আসে-ও। আমিও এসেছি। প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড় বাড়িতে থাকি। রাত্রি তিনটে থেকে কাছে কোথাও একজন গলাভাঙ্গা একঘেয়ে সুরে ভজন শুরু করে, ঘুম ভেঙ্গে যায়; দোর খুলে বারান্দায় এসে বসি। ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হ'য়ে আসে,—পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে দোয়েল। অন্ধকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপরে একটি-দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি—পাশের বাড়ির আমগাছে, এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে, পথের ধারের অশ্বত্থ গাছের মাথায়—সকলকে চোখে দেখতে পেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হ'তো যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি। হলদে রঙের একজোড়া, বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসতো। প্রাচীরের ধারে ইউক্যালিপটস্ গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেতো। হঠাৎ কি জানি কেন দিন-দুই এলো না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম,—কেউ ধরলে না ত? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই, —পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা—কিন্তু তিন দিনের দিন আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হ'লো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।

আমার সঙ্গে এসেছিল একটি যুবক বন্ধু। নিঃস্বার্থ তার সেবা,—কলকাতায় ভারী অসুখের সময়েও যেমন দেখেচি, এখানেও দেখতে পেলাম তেমনি। মাঝে মাঝে সে বলতো—চলুন দাদা, আজ একটু বেড়িয়ে আসবেন। আমি বলতাম, তুমি যাও ভাই, আমি এখানে বসেই ও-কাজটা সেরে নিই। সে অসহিষ্ণু হয়ে বলতো—আপনার চেয়েও কত বেশী বয়সের লোকে এখানে বেড়িয়ে বেড়ায়। একটু চলাফেরা না করলে ক্ষিদে হবে কেন? বলতাম, ওটা কম হলেও সইবে, কিন্তু পথে পথে মিছিমিছি ঘুরে বেড়ানো সইবে না।

সে রাগ করে একলাই বেড়াতে যেতো। কিন্তু সাবধান করে দিত,—অন্ধকারে বাড়ি ফিরবেন না যেন। আলো আনতে চাকরদের ডাকবেন। এদিকে 'করেত' সাপটা কিছু বেশী। নিরীহ জীব, কেবল গায়ে পা দেওয়াটা তারা পছন্দ করে না।

সেদিন বন্ধু গেছেন ভ্রমণে। সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে, দেখি জনকয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি ক্ষুধা আহরণের কর্তব্যটা সমাধা করে যথাশক্তি দ্রুতপদেরই বাসায় ফিরছেন। সম্ভবতঃ এঁরা বাতব্যাধিগ্রস্ত, সন্ধ্যার পূর্বেই এঁদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তাঁদের চলন দেখে ভরসা হ'লো ভাবলাম যাই, আমিও একটু ঘুরে আসিগে। সেদিন পথে পথে অনেক বেড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এলো, ভেবেছিলাম আমি একাকী, হঠাৎ পিছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পিছনে চলেছে। বললাম, কি রে, যাবি আমার সঙ্গে? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবি? সে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। বুঝলাম সে রাজী আছে। বললাম, তবে আয় আমার সঙ্গে। পথের ধারের একটা আলোতে দেখতে পেলাম কুকুরটার বয়স হয়েছে, রোগে পিঠের লোম উঠে গেছে, একটু খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তিসামর্থ্য ছিল তা বুঝা যায়। তাকে অনেক প্রশ্ন করতে করতে বাড়ির সুমুখে এসে পৌঁছলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম, ভেতরে আয়। আজ তুই আমার অতিথি। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগলো, কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেলে না। আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হ'ল, গেট বন্ধ করে দিতে চাইলে, বললাম, না, খোলাই থাক। যদি আসে, ওকে খেতে দিস। ঘন্টা-খানেক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে আসেনি—কোথায় চলে গেছে।

পরদিন সকালে বাইরে এসেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সেই কালকের অতিথি। বললাম, কাল

হঠাৎ শরীরটা খারাপ হ'লো, দিন-দুই নীচে নামতে পারলাম না। দুপুরবেলা উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে, খবরের কাগজটা সেইমাত্র পড়া হয়ে গেছে, জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের রৌদ্রতপ্ত নীল আকাশের পানে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম, কংগ্রেসের পাণ্ডা যাঁরা—মন্ত্রী হবার তাদের কি উগ্র বাসনা। অথচ নিস্পৃহতার আবরণে সেটা গোপন করার কত-না কৌশল! আইন যারা বানিয়ে দিলে একটা কথাও শুনলে না, ব্যাখ্যা নিয়ে তাদেরই সঙ্গে কি ঝুটোপুটি লড়াই! নিঃসন্দেহে প্রমাণ দিতে চায় ওদের মতলব ভাল নয়। বিড়ম্বনা আর বলে কারে!

সহসা খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল কুকুরের। মুখ বাড়িয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। দুপুরবেলা চাকরেরা সব ঘুমিয়েছে, ঘর দোর বন্ধ, এই সুযোগে লুকিয়ে সে একেবারে আমার ঘরের সামনে এসে হাজির। ভাবলাম, দুদিন দেখতে পায়নি, তাই বুঝি আমাকে ও দেখতে এসেছে। ডাকলাম, আয় অতিথি, ঘরে আয়। সে এলো না, সেখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগলো। জিজ্ঞাসা করলাম—খাওয়া হয়েছে ত রে? কি খেলি আজ?

হঠাৎ মনে হ'লো ওর চোখ দুটো যেন ভিজেভিজে, যেন গোপনে আমার কাছে কি একটা ও নালিশ জানাতে চায়। চাকরদের হাঁক দিলাম, ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুটে পালালো।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁ রে, কুকুরটারে আজ খেতে দিয়েছিস?

আজ্ঞে না। মালী-বৌ তাড়িয়ে দিয়েছে যে।

আজ ত অনেক খাবার বেঁচেছে, সে সব হ'ল কি?

মালী-বৌ চেঁচেপুঁচে নিয়ে গেছে।

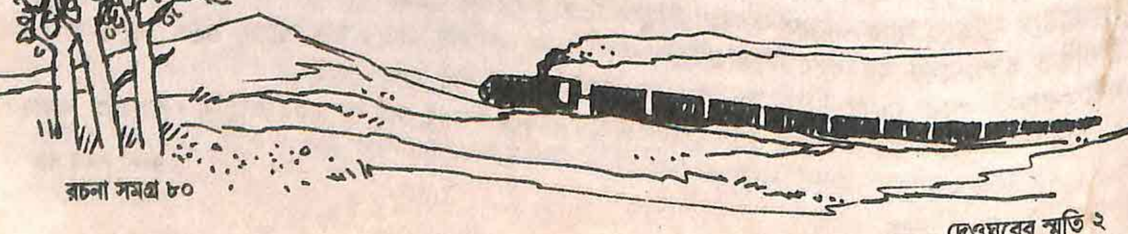
হাঙ্গামা শুনে বন্ধু ঘুম ভেঙ্গে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরে এলেন, মুচকি হেসে বললেন, দাদার এক কাণ্ড! মনুষে খেতে পায় না, পথের কুকুরকে ডেকে খাওয়ানো! বেশ। বন্ধু জানেন এর চেয়ে অকাট্য যুক্তি আর নেই। মানুষকে না দিয়ে কুকুরকে দেওয়া। শুনে চুপ করে রইলাম। সংসারে কার দাবী যে কার কাছে কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, সে ওদের আমি বোঝাবো কি দিয়ে?

সে যাই হোক, আমার অতিথিকে ডেকে আনা হ'লো, আবার সে বারান্দার নীচে উঠনের ধূলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান করে নিলে। মালী-বৌয়ের ভয়টা তার গেছে। বেলা যায়, বিকাল হলে উপরের বারান্দা থেকে দেখি অতিথি এই দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াতে যাবার সময় হ'ল যে।

শরীর সারলো না, দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে পড়লো। তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে। আজ সকাল থেকে জিনিস বাঁধাবাঁধি শুরু হ'লো,—দুপুরের ট্রেন। গেটের বাইরে সার সার গাড়ি এসে দাঁড়ালো, মালপত্র বোঝাই দেওয়া চললো। অতিথি মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি ক'রে খবরদারি করতে লাগলো, কোথাও যেন কিছু ক্ষোয়া না যায়। তার উৎসাহই সব চেয়ে বেশী।

টিকিট কেনা হ'লো, মালপত্র তোলা হ'লো, বন্ধু এসে খবর দিলেন—ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকশিশ পেলে সবাই, পেল না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধূলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে; যাবার আগে তারই মধ্যে দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম—স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ,—ঢোকবার জো নেই! পথে দাঁড়িয়ে দিন-দুই তার কাটবে, হয়ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা,—তার পরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।

হয়ত, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই, তবু, দেওঘর বাসের ক'টা দিনের স্মৃতি ওকে মনে করেই লিখে রেখে গেলাম।



প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

দাম : ৫ টাকা।

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২